রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ—১০ম সংখ্যা

মৃত্যু-পণ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী
১০৫, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আগষ্ট, ১৯৪১

দাম : ছ' আনা

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানীর পক্ষ হইতে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শুক্লা প্রেস, ৭-১, বাবুলাল
লেন হইতে শ্রীবিষ্ণুদত্ত শুক্লা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মৃত্যু-পণ

এক

উলুবেড়িয়ার পাশে গঙ্গার ধার ঘেঁসিয়া লালপুর গ্রাম। শিল্পী ললিত চাটুজ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে সেই গ্রামে একখানা বাড়ী পাইয়াছিল। নদীর উপরেই বাড়ীখানা। আশেপাশে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ ধানজমি আর জলা, কাছাকাছি লোকালয় নাই। ললিতের কাছে স্থানটি বড়ই মনোরম লাগিয়াছে! বাড়ীখানাকে সাজাইয়া গুছাইয়া সংস্কার করিয়া ললিত তাহার কয়েকজন বন্ধুকে সান্ধ্য-ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। বন্ধুরা আসিয়া হৈহল্লা করিয়া বিকাল হইতে রাত আটটা পর্য্যন্ত সমস্ত পল্লী প্রকম্পিত করিয়া আহারান্তে বিদায় গ্রহণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। উলুবেড়িয়ার এক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে দু'জন রাঁধুনী-বামুন আসিয়াছিল; পয়সা লইয়া তাহারা চলিয়া গেল। একটি ভৃত্য লইয়া ললিত এখানে থাকে; একাদিক্রমে বেশীদিন থাকে না; চার-পাঁচদিন থাকিয়া আবার কলিকাতায় চলিয়া

যায়। ভৃত্য জানাইল, কাল সকালে চাষাদের ডাকিয়া সে বাসনপত্র মাঁজিয়া পরিষ্কার করাইবে। ললিত বন্ধুদের ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে গেল।

কলিকাতাগামী শেষ ট্রেনে চাপিয়া বন্ধুরা চলিয়া গেল। ললিত ফিরিল। ষ্টেশন হইতে তাহার বাংলো অনেকখানি পথ। আকাশে চাঁদ আছে। তাই পথ চলিতে কষ্ট নাই। ললিত নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হইল। তাহার বাড়ীর লাগোয়া আছে একটা ভাঙাচোরা জাহাজ-আপিসের মত একতালা বাড়ী; তাহার সহিত একটা জেটির মতও আছে; দু'এর অবস্থাই শোচনীয়। জেটি ও হেলে-পড়া মাঠকোঠা পার হইয়া ললিত নিজের বাড়ীর জমিতে পা দিল। মাথাটা দপ্ দপ্ করিতেছে। সারাদিনের খাটাখাটুনীর ফল। আজ রাতটা কোন রকমে এখানে কাটাইয়া দিয়া ললিত কাল কলিকাতায় ফিরিবে। অনেক কাজ জমিয়া আছে সেখানে।

একখানা কালো মেঘ চাঁদকে গিলিয়া ফেলিয়াছে। জলা হইতে কঁক্ কঁক্ স্বরে কি একটা জানোয়ার শব্দ করিতেছে; ললিতের গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। মনে হইল যেন, সে একা নয়, তাহার পিছনে পিছনে কে আসিতেছে। ললিত জোরে জোরে পা চালাইল। অদূরে বাড়ীর রোয়াকে উঠিবার চওড়া সিঁড়ি! ললিত হোঁচট্ খাইল। তাহার কণ্ঠ দিয়া অস্ফুট বিস্ময়ের ধ্বনি বাহির হইল। টাল্ সামলাইতে না পারিয়া সে একটা লম্বা-চওড়া নরম জিনিষের উপর পড়িয়া-

ছিল—শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ললিত, তাহার পায়ের কাছে একটা মানুষ শুইয়া আছে!

—কে! কে তুমি? এ-ভাবে প'ড়ে কেন? অ্যাঁ! ললিত জোরে জোরে হাঁকিল। কোন সাড়া আসিল না। মিনিট-খানেক হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ললিত এক ছুটে রোয়াকে উঠিয়া সাম্‌নের ঘরে যে লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, তাহা লইয়া আসিল।

ক্ষীণ আলো পড়িল শায়িত লোকটার মুখের উপর! সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনটা ললিতের হাত হইতে খসিয়া পড়িল! লোকটার প্রাণহীণ নিস্পন্দ চোখ দুইটা আকাশের দিকে নিবদ্ধ; মৃতের মুখ! লোকটা মরিয়া গেছে! শুধু মরিয়া গেছে নয়, খুন্ হইয়াছে! বুকের কাছে থোলো থোলো রক্ত জমাট বাঁধিয়াছে; মাঝখানে একটা ছুরি আমূল বসানো! ভয়ঙ্কর দৃশ্য! লোকটার গায়ে গলাবন্ধ শাদা কোট; পিতলের বড় বড় বোতাম, মাথার টুপিটা একপাশে পড়িয়া আছে। পোষাক দেখিয়া মনে হয়, জাহাজের সারেং বা হেড্ খালাসী! এ তল্লাটে গঙ্গার উপর মাঝে মাঝে জাহাজ দাঁড়ায়! কলিকাতা হইতে কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত মানোয়ারী জাহাজের প্রায়ই আনাগোনা এ অঞ্চলে। কিন্তু জাহাজ হইতে লোকটা এখানে আসিল কেমন করিয়া?

ললিত আবার বাড়ীর মধ্যে গেল। চাকরটা রান্নাঘরের পাশে বসিয়া ঢুলিতেছে। তাহাকে উঠাইয়া দু'জনে দু'টা লণ্ঠন লইয়া বাহিরে আসিল। পুলিশে খবর দিতে হইবে।

চাকরটা ভ্যাবাগঙ্গারামের মত কহিল—পুলিশ! পুলিশ কেনে কর্ত্তা?

—আর ক্যানে কর্ত্তা! খুন! মানুষ খুন!

—অ্যাঁ, খুন? কোথায়?

—আয় না দেখবি।

ভৃত্যকে লইয়া ললিত রোয়াক হইতে নীচে নামিল। লণ্ঠনের আলো ফেলিয়া কহিল—ওইখানে মাটির ওপর···

কিন্তু মাটির উপর কোথায়? কোন মানুষের দেহ তো নাই! স্তম্ভিত ললিতের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। লাশ পাচার!

—কই, কাউকে তো দেখছিনে কর্ত্তা!

—হুঁ! লাশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে!

ললিত বুঝিল, এখানে শুধু মৃতদেহটাই ছিল, না আশে-পাশে অন্য লোকও ওৎ পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

দুই

দিন দুই পরে। মেট্রোয় একখানা রোমাঞ্চ-চিত্র দেখানো হইতেছিল। ইন্‌টারভ্যালের সময় বহুদিন পরে দুই পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে দেখা হইল।

—আরে, মিঃ মিত্র! আপনি এখানে!

—তাই তো দেখছি! আপনিও?

—এই যে সতুবাবুও আছেন।

কথা বলিতে বলিতে তিনজনে বাহিরে আসিল। তিন-জনের মধ্যে একজন এই সিরিজের পরিচিত ডিটেক্‌টিভ মোহনলাল; অপরজন তাহার বন্ধু ও সহচর সতু; তৃতীয় ব্যক্তি উলুবেড়িয়ার ললিত চাটুজ্যে। অশোক মজুমদারের বিশেষ বন্ধু ললিত; সেই সূত্রে মোহনলালের সহিত তাহার আলাপ।*

'বারে' আসিয়া ললিত কহিল—বলুন, মোহনলালবাবু, আপনাকে কি 'অফার' করতে পারি?

মোহনলাল আপত্তি করিল; ললিত ছাড়িল না; আইস্‌ক্রীম, শরবৎ প্রভৃতি আসিল। কথায় কথায় আজিকার ছবির কথা উঠিল। ললিত কহিল—বাজে ছবি! প্লটের বাঁধুনি নেই। তাছাড়া, ঘটনাগুলো অসম্ভব মনে হয়। ওরা যদি আসে আমার কাছে, প্লট দিতে পারি ফার্ষ্ট ক্লাস। সত্যিকার ঘটনা।

মোহনলাল হাসিয়া কহিল—বলেন কি! সত্যি ঘটনা। জীবনে তাহলে রোমাঞ্চ ঘটেছে!

গভীর গলায় ললিত কহিল—সত্যিই ঘটেছে মোহনলাল-বাবু। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন কথা খবরের কাগজে ছাপা হয়নি; এবং হত্যাকারী হয়ত কোনও দিনই ধরা পড়বে না। শুনুন, বলি।

ললিতের মুখে ঘটনাটা শুনিয়া সতু কহিল—লাশ উধাও! সহজ ব্যাপার নয়।

---

* এই সিরিজের ১ম গ্রন্থ 'বাগান-বাড়ীর বিভীষিকা' দ্রষ্টব্য।

মোহনলাল কোন মন্তব্য করিল না। তাহার নজর ছিল অন্য দিকে। অদূরে একটা নীলজামাপরা কুৎসিত-মুখো লোক পায়চারী করিতেছে, আর তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে; হ্যাঁ, তাহাদেরই লক্ষ্য করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকটার বাঁ-কানটা অদ্ভুতধরণের। কানের প্রান্তভাগ মাথার সঙ্গে যেন চেপ্‌টাইয়া লাগিয়া আছে।

ললিত কহিল—লোকটা কে বলুন তো মোহনলালবাবু? যেন আমাদের 'ওয়াচ্' করছে মনে হয়! চেনেন নাকি?

—উহুঁ। জীবনে দেখিনি। মোহনলাল কহিল—যাই হোক, আপনার কথা শুনে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়েছি ললিতবাবু! ব্যাপারটা সাধারণ নয়।

—যাবেন আমার বাংলোয়? দেখুন না তদন্ত ক'রে?

মোহনলাল কহিল—কথা দিতে পারছি না। তবে কাল পরশু আমায় একবার রাজগঞ্জ যেতে হবে। সেই সময় পারি তো আপনার গাঁ লালপুর ঘুরে আসবো। আপনি কাল সেখানে যাচ্ছেন?

—আপনি যখন বলছেন, তখন যাব।

আর কোন কথা হইল না। শো-র শেষে ললিত তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া বাসে উঠিল। সাবধানে লক্ষ্য করিয়া মোহনলাল দেখিল, সেই নীলজামাপরা কান-চেপ্‌টা লোকটা দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে! বাহিরে আসিয়া লোকটা একখানা ট্যাক্‌সিতে উঠিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া গেল।

মিহির, মায়া ও তপেন কলিকাতায় আসিয়াছে।* বিশেষ করিয়া তাহাকে ও সতুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেছে। না গেলেই নয়। সতুকে লইয়া মোহনলাল তাহাদের বাসা অভিমুখে চলিল।

নিমন্ত্রণ সারিয়া মোহনলাল রাত ন'টা নাগাদ নিজের বাসায় ফিরিল। সতু সঙ্গে আছে। সতুর কয়েকখানা বইএর দরকার। বই লইয়া সে বাড়ী ফিরিবে।

বাসার ঘরগুলা অন্ধকার। ফাঁকীবাজ বলদেও বোধ হয় সদর দরজায় চাবী লাগাইয়া যাত্রা শুনিতে গেছে। সদর দরজায় তালার পরিবর্ত্তে চাবী দেওয়ার ব্যবস্থা। দুইটা চাবী, একটা থাকে মনিবের কাছে; একটা চাকরের কাছে। মোহনলাল পকেট হইতে চাবী বাহির করিয়া কলের ভিতর ঢুকাইল। পরক্ষণেই হঠাৎ দরজার পিছনে বাড়ীর মধ্যে যেন একসঙ্গে একশত বোমা ফাটিয়া পড়িল···সদর দরজার উপরে যে বড় ভেন্‌টিলেটার ছিল, তাহার ভিতর দিয়া আগুন ছিট্‌কাইয়া আসিল···তারপর দুদ্দাড় শব্দে দরজার পাল্লা দু'খানা মড় মড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ে ভাঙিয়া পড়িল। সতুকে টান মারিয়া মোহনলাল সরিয়া গেল; তাহা হইলেও একখানা পাল্লার ধাক্কা লাগিয়া উভয়েই ছিট্‌কাইয়া পড়িল; ভাগ্যক্রমে দু'জনের কেহই বিশেষ আহত হইল না।

---

* এই সিরিজের ২য় গ্রন্থ 'মগের মুলুকে মোহনলাল' দ্রষ্টব্য।

দরজার পিছন হইতে রাশি রাশি বারুদের ধোঁয়া! সতু কহিল—কি ভীষণ ব্যাপার! এ কেমন ক'রে কি হল?

মোহনলাল কহিল—কান্-চেপ্টা লোকটাকে স্মরণ কর সতু! সম্ভবত এ তারই কাজ! আমি যাতে লালপুর গিয়ে নিহত নাবিকের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত না করতে পারি, তারই জন্যে সে এবং তার দলের লোকেরা এই আয়োজন করেছিল!

তিন

বোমা ফাটার প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে দরজা ভাঙিয়া পড়িবার পর মোহনলাল ও সতু কিছুক্ষণ রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে দু'চারজন পথিক জড় হইয়া গেছে। আশপাশের বাড়ী হইতে লোকজন মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছে, ব্যাপার কি! রাস্তার মোড় হইতে কনষ্টেবল আসিল; সেলাম করিয়া মোহনলালকে প্রশ্ন করিল—ব্যাপার কি, হুজুর; বোম্…

—হ্যাঁ, সেপাই, বোম্! মোহনলাল কহিল—আমার দরজার পাশেই ছিল। দরজার চাবীকলে চাবী লাগাবামাত্র ইলেক্ট্রিক তার ফিউজ্ হয়। বোমার এই তার চাবীর পিতলের সঙ্গে বোধ হয় কোন রকমে আটকে রাখা হয়েছিল। বলিতে বলিতে মোহনলাল, কনষ্টেবল ও সতুকে লইয়া ভিতরে ঢুকিল। চারিদিক চাহিয়া মোহনলাল কহিল—যা ভেবেছি, তাই। বোমাটা ছিল এইখানে। আয়োজন যে করেছে, সে সাধারণ চোর-

ছ্যাঁচোড় নয়, রীতিমত বৈজ্ঞানিক; শুধু সময় সম্বন্ধে একটু ভুল হয়েছিল। আমি কলে চাবী পরাবার সঙ্গে তার ফিউজ হয়ে পুড়তে পুড়তে বোমার গায়ে গিয়ে লাগবে—এই ব্যবস্থানটুকু আমাদের বাঁচিয়েছে। আমার বন্ধু ভেবেছিল, ঠিক যেমন আমি চাবী খুলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াব, অমনি বোমাটা ফেটে আমায় একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। কিন্তু সেটা ফাটলো তার আগেই। তবুও আমরা অল্পের জন্যেই বেঁচেছি—দরজাটা ছিল খুব শক্ত, তাই!

আকস্মিক ঘটনার বিহ্বলতা তখনো কাটে নাই। সতু কহিল—কিন্তু এ যে আপনাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র! কে একাজ করলে? আর, বলদেও, সে-ই বা গেল কোথায়?

বলদেও মোহনলালের ভৃত্য। সতুর কথার কোন উত্তর না দিয়া মোহনলাল এঘর ওঘর খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে বাথরুমের মধ্যে হাত-পা-মুখবাঁধা বলদেওকে পাওয়া গেল। আহার শেষ করিয়া সে মুখ হাত ধুইতেছে, এমন সময় অতর্কিতে একটা লোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া এই দশা করিয়াছে। না, তাহার মুখ সে দেখিতে পায় নাই; মুখে কাপড় ঢাকা ছিল। একজনই ছিল, একজনের বেশী নয়।

কিছুক্ষণ পরে কনষ্টেবল চলিয়া গেল। বন্ধনমুক্ত হইয়া বলদেও সদর দরজাটা এবং সেখানকার দেওয়াল-ধ্বসা আবর্জ্জনা সংস্কারে মন দিল। মোহনলাল বলিল—সেই কানচেপ্টা লোকটাকে ভুল না সতু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ তারই কাজ।

মরা সারেং মিথ্যে নয়। লালপুরে কিছু একটা সাংঘাতিক কাণ্ড চলেছে, তাই যাতে আমি সেদিকে না যাই, তার জন্যে গোড়া বেঁধে কাজ করতে চায় আমার অপরিচিত বন্ধুরা!

সতু কহিল—ললিত আপনার সঙ্গে কথা বলছে দেখে ওদের সন্দেহ হয় যে ললিত হয়ত আপনাকে ওদের সম্বন্ধেই বলছে!

—ঠিক তাই। স্বাভাবিক সন্দেহ। সুতরাং গোড়াতেই আমায় খতম্ করার চেষ্টা। দেখা যাক। আজকের কাণ্ডটি সোজা নয়। বোমা নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলতে পারে, তারা সহজে পিছবে না। মোহনলালের দুই চোখ জ্বলজ্বল করিতে লাগিল—কিন্তু পিছবো কি আমিও? না। মৃত্যুকে সামনে রেখে অনেকবারই কাজ করেছি। এবারও মৃত্যু-পণ করলাম। কাল যাব উলুবেড়ে।

পরদিন সকালে মিস্ত্রি ডাকিয়া সতু দরজা ঠিক করিতে লাগিল। মোহনলাল গেল, গভর্ণমেণ্টের নৌ-বিভাগের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে। নৌ-দপ্তরের বড়কর্ত্তার সঙ্গে মোহনলালের বহুদিনের পরিচয়। সাহেব কহিলেন—খবর কি বল? হঠাৎ তোমার আবির্ভাব?

কথায় কথায় মোহনলাল কহিল—একটা খবর জানতে এলাম। কলকাতায় যে-সব জাহাজ আসা-যাওয়া করে ব অপেক্ষা করে, তাদের নাবিকদের নামধাম তো আপনার আপিসে আসে?

—আসে বৈকি!

মোহনলাল কহিল—সম্প্রতি কোন জাহাজের কোন সারেং বা খালাসী বা লস্কর নিরুদ্দেশ হয়েছে, এমন সংবাদ এসেছে আপনার কাছে ?

তাহার কথা শুনিয়া সাহেব ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া বলিলেন—তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না। আচ্ছা, আমি দেখছি। বলিয়া তিনি ছোট সাহেবকে ডাকিলেন। ছোট সাহেব লেবার অফিসারকে ডাকিলেন, লেবার অফিসার তাহার ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুকে ডাকিল, বড়বাবু ডাকিল, ডকস্থ জাহাজের প্রধান ইনস্‌পেক্টারকে। ইনস্‌পেক্টার খাতা খুলিয়া দেখিয়া বলিল—মৃত তিনর্জন; অসুস্থ ছ'জন; নিরুদ্দেশ দু'জন।

বড় সাহেব মোহনলালেরর দিকে চাহিলেন। মোহনলাল বলিল—নিরুদ্দেশ দু'জনের নাম ?

—একর্জনের নাম, মাসুম; হেড লস্কর্। 'এস্ এস্ অজন্তায়' কাজ করত, দশ বছরের চাকরি। ডায়মণ্ডহারবারে নেমে এক হপ্তার ছুটি নিয়েছিল। উলুবেড়িয়ার ডক থেকে আবার জাহাজ ধরবে কথা ছিল। এক সপ্তাহ পার হয়েছে, তার কোন খোঁজ খবর নেই।

—আর একজন ?

ইনস্‌পেক্টার নোটবই দেখিয়া বলিতে লাগিল—এ লোকটা পলাতক! নাম, লাম্‌ডিং কোঠারি। বয়স ছত্রিশ। চরিত্রে দাগ আছে। একমাসের ওপর পলাতক। ডুবুরি হিসাবে লোকটার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। বহু আগে, একবার

একখানা ডুবুরি-জাহাজের অফিসাররূপে জলে নেমে একটা ডোবা জাহাজের মালপত্র উদ্ধার করেছিল।

—সম্প্রতি বালির চরে যে দু'খানা জাহাজ ডুবেছিল, তার সঙ্গে এদের কোন যোগ আছে ?

—না।

বড় সাহেবের সঙ্গে দু'চারটা প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া মোহনলাল তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইল। বিবরণ শুনিয়া সতু কহিল—আমার বোধ হচ্ছে, যে সেলার খুন হয়েছে, সে মানুষ ! উলুবেড়েয় তার যাবার সংবাদ রিপোর্ট থেকে পাওয়া গেছে। উলুবেড়ে আর লালপুর একই কথা।

অন্যমনস্কভাবে মোহনলাল বলিল—এক কথা হোক আর দু'কথা হোক, তুমি সুটকেশ আর বিছানাপত্র গুছিয়ে নাও; আমরা যাব লালপুর। সাহেবের কাছে ওই তল্লাটের ম্যাপ দেখে এসেছি; লালপুরের এদিকে গঙ্গা আর তিনদিকে জলা; সরু একটি পথ আছে, সহরের রাস্তায় আসবার। আমার বিশ্বাস, সেই জলার অন্তরালে ভীষণ কোন চক্রান্ত পাকছে !

চার

অপরাহ্ন-বেলায় দু'জনে লালপুর পৌঁছিল এবং ষ্টেশনে মালপত্র রাখিয়া সোজা ললিতের বাংলোয় গিয়া হাজির হইল। তদন্ত আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঘটনাস্থলটিকে একবার স্বচক্ষে এবং

ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া মোহনলালের চিরদিনের অভ্যাস। ঘটনাস্থল হইতেই সে অনেকবার অনেক বিস্ময়কর সূত্র আবিষ্কার করিয়াছে। সেবার রমলার নিরুদ্দিষ্ট বাপের সম্বন্ধে তদন্ত করিতে গিয়া সে মাঠের উপর ঘটনার জায়গা হইতেই প্রথম সূত্র ধরিতে পারিয়াছিল।*

সতু কহিল—ললিতবাবুর কথা অনুসারে এই জায়গাটাতে তিনি লস্করের মৃতদেহ দেখেছিলেন। বলিয়া রোয়াকের নীচে ঘাসের উপর একটা স্থান নির্দ্দেশ করিল।

মোহনলাল ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিদিক দেখিল, তারপর আপনমনে বলিতে লাগিল—হত্যা ক'রে তারপর মৃতদেহটাকে সরিয়ে ফেলার পিছনে আছে গূঢ় রহস্য! খুন করবার পরেই হয়ত ললিত এসে পড়ে। তাই সে-সময়ের জন্যে হত্যাকারীকে লুকতে হয়। তারপর ললিত বাড়ীর মধ্যে যাবামাত্র খুনি লাশটাকে সরায়। বোধ হয় একজনের বেশী লোক এই হত্যার পিছনে আছে। লাশটাকে সরিয়ে ফেলার অর্থ সহজেই বোঝা যায়। হত্যাকারীর দল চায় না যে, নিহত লোকটার সম্বন্ধে পুলিশ কোন কথা জানতে পারে! মাসুমকেই যদি খুন করা হয়ে থাকে, তাহলে সহজেই পুলিশ তাকে চিনে ফেলতো, লস্করদের ফটো পুলিশ আপিসে পাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরে মোহনলাল কহিল—চল, বাজারের দিকে

---

* এই সিরিজের ৩নং গ্রন্থ 'রহস্যচক্রে রমলা' দ্রষ্টব্য।

যাওয়া যাক। হোটেল বা সরাইখানা একটা সন্ধান করতে হবে। আড্ডা গাড়তে না পারলে খোঁজ মিলবে না।

মাছ সরবরাহের কেন্দ্রস্থলরূপে উলুবেড়িয়ার বাজার বেশ বড়। হাওড়া, কলিকাতা এবং চব্বিশপরগণার বহু স্থান হইতে বহু লোক নিত্য এখানে আসে। বাজার সর্ব্বদা সরগরম। লালপুর গ্রাম মাইলখানেকের মধ্যে। ব্যবসাকেন্দ্রের অত কাছে, কিন্তু যেন ঘুমন্ত পুরী। বাজারে যখন লোক আর ধরে না, তখন কতক লোক ছিট্‌কাইয়া এই গ্রামে আসিয়া পাঁচ-সাত দিনের জন্য আস্তানা নেয়। দু'একটি বড় সরাইখানা আছে; তার মধ্যে একটির মালিক, এলাহি কাদের। প্রৌঢ় লোকটি। নিরীহ ভালমানুষ। হোটেলটিও তাহার ভাল। চা ও সর্ব্ববিধ আহার্য্য পাওয়া যায়। মাঠকোঠা। দোতালা। উপরতালায় দু'তিনখানা ঘরে যাত্রী রাখে। মোহনলাল ও সতু কাদেরের হোটেলে ঢুকিল।

—সেলাম আলেকম্‌।

—সেলাম আলেকম্‌।

—দু'চারদিন থাকতে চাই, খাঁ সাহেব। ঘর আছে?

ভদ্রলোক দেখিয়া সসম্ভ্রমে কাদের কহিল—ঘর, একখানা ঘর আছে হুজুর! আর সব ভর্ত্তি! অনেক লোক এসে পড়েছে গাঁয়ে। যে-ঘর আছে সেটা খুব ছোট।

—অনেক লোক এসে পড়েছে! এত লোক কোথা থেকে এলো?

অদূরে বেঞ্চির শেষ প্রান্তে বসিয়া মুখের সাম্নে খবরের কাগজ মেলিয়া ধরিয়া এক ব্যক্তি বসিয়াছিল। তাহার পানে বারেক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাদের কহিল—একটা নতুন জাহাজ কোম্পানী হচ্ছে কি না, তাদের সব লোকজন…

খবরের কাগজখানার খড় খড় শব্দ হইল। কাদের সেদিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর তাহার কথায় ও আচরণে ভাবান্তর ঘটিল, কহিল—তাই তো, ঘর তো নেই, হুজুর ; যে· ঘরখানা আছে, সেখানাও দেবার উপায় নেই। আমি ইতিমধ্যে আমার একজন খদ্দের—জীহন দারুক সাহেবকে বলেছি, তাঁর একজন বন্ধু আসছেন তাঁকে ঘরখানা ছেড়ে দিতে হবে।

মোহনলাল নিশ্চয় বুঝিল, খবরের-কাগজ-পাঠনিরত লোকটা এবং হোটেলওয়ালার মধ্যে কোন ইসারার আদান-প্রদান হইল। সেই জন্যই এলাহি কাদের মোহনলালকে ঘর দিতে রাজী হইতেছে না। মোহনলাল প্রশ্ন করিল—জীহন দারুক, ইনি কে ?

—ইনি হচ্ছেন, নতুন জাহাজ কোম্পানীর মালিক। যাই হোক, আপনাদের অসুবিধা হবে না। ঠিক মোড়ের মাথায় থাকো বাড়ীওয়ালীর ভাল হোটেল আছে; সেখানে আপনাদের দু'জনের…

মোহনলাল কিন্তু নাছোড়বান্দা। কহিল—আমার বন্ধু বরঞ্চ থাকো বাড়ীউলির হোটেলে যাক, আমি এইখানে থাকবো। জায়গাটি আমার ভাল লেগেছে।

মুঠার মধ্যে ডবল পয়সা পাইয়া নিরীহ কাদের আর কোন কথা কহিতে পারিল না; মোহনলালকে ঘর খুলিয়া দিল। সতু মোঁড়ের বাড়ীওয়ালির হোটেলে চলিয়া গেল। মোহনলাল তাহাকে সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকিতে বলিল।

ইতিমধ্যে খবরের-কাগজ পাঠনিরত লোকটা অন্তর্হিত হইয়াছে। মোহনলাল স্পষ্ট উপলব্ধি করিল, এখানকার একাধিক লোক তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে এবং এই শান্ত স্তব্ধ পল্লী-গ্রামের ভিতর কোন ভীষণ দুষ্কর্ম্মের আয়োজন ঘনাইয়া উঠিতেছে!

সন্ধ্যার পর কাদেরের হোটেলের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া মোহনলাল সতুর হোটেল অভিমুখে রওনা হইল। সতু ঠিকমত স্থান পাইয়াছে কিনা দেখিয়া আসা যাক। নির্জ্জন পল্লীপথ। দুই ধারে বড় বড় পগার; ধারে ধারে শিমুল, বট, অশত্থের গাছ; অশথগাছের শিকড়ের মোটা মোটা ঝুরি মাটি পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। মোহনলাল শান্তপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অকস্মাৎ রাস্তা যেন বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হইল। পিছনে কিছুদূরে ঘর্ঘর শব্দ। ঘাড় ফিরাইয়া মোহনলাল দেখিল, প্রকাণ্ড একটা মোটর মোড় ঘুরিয়া এই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারই হেড্-লাইটের তীব্র আঁলো পড়িয়াছে পথের উপর। তীরবেগে মোটরখানা আসিতেছে।

তারপর···চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। হঠাৎ মোহনলাল বুঝিতে পারিল,

মোটর চালক হেড্-লাইটের আলোয় পথের মাঝখানে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে এবং মোহনলাল পথের পাশে সরিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ঝড়ের বেগে মোটরখানা যেন তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য তাহারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে···

পাঁচ

সাক্ষাৎ মৃত্যু আসিতেছে উদ্দাম গতিতে···মাত্র কয়েকহাত দূরে···মোহনলাল নিশ্চয় বুঝিল, চালক তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই মোটর ছুটাইয়াছে···তাহার ঘাড়ের উপর মোটরখানা আসিল বলিয়া···মৃত্যুব ক্ষুধিত গর্জ্জন···উত্তপ্ত নিঃশ্বাস···

মুহূর্ত্তের মধ্যে মোহনলাল বাঁচিবার উপায় স্থির করিয়া লইল। আশেপাশে দৌড়াইতে গেলে কোন ফল হইবে না। তাহার চেয়ে···হাত দশেক দূরে বটগাছের বড় একটা শিকড় নামিয়াছে, নাগালের মধ্যে। মোহনলালের জানা ছিল, শিকড়গুলা খুব শক্ত হয়; সে দ্রুতবেগে দৌড়িয়া গিয়া লাফ দিয়া সেই শিকড়টা দুই হাতে ধরিল এবং অপূর্ব্ব কৌশলে নিমেষমধ্যে দু'পা উঁচুতে তুলিয়া শিকড় ধরিয়া কিছু উপরে উঠিয়া গেল···নিমেষ মাত্র···তাহারই মধ্যে মোটরখানা সগর্জ্জনে মোহনলালের নীচ দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল; গাড়ীর চালে তাহার পা ঠেকিয়া গেল; ঠিক সময়মত শিকড় ধরিয়া উঠিতে না পারিলে মোহনলালের দেহ এতক্ষণে মাটির সঙ্গে পিসিয়া

মিশিয়া থাকিত। মোটরখানা থামিল না, ডানদিকে মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

মোহনলাল মাটিতে নামিল। উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখনো মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে! অনেকবার অনেক স্থানে অল্পের জন্য তাহার প্রাণ বাঁচিয়াছে। কিন্তু এমনধারা বিপদ কখনো ঘটে নাই···মুহূর্ত্তের এদিক ওদিক হইলেই আজ আর তাহাকে বাঁচিয়া বাড়ী ফিরিতে হইত না। অল্প সময়ের মধ্যে তাহার জীবনের উপর দুইবার আক্রমণ হইল। সুতরাং তাহার অনুমান এবং মৃত্যু-পণ দুই-ই দৃঢ়তর হইল।

ধীরে ধীরে সেই নির্জ্জন রাস্তা পার হইয়া সে লোকালয়ের কাছাকাছি আসিল। পানওয়ালার দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, অদূরে যে দোতালা টিনের বাড়ী দেখা যাইতেছে, তাহাই থাকো বাড়ীওয়ালির হোটেল।

হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই একটি ছোকরা বারকয়েক ভীতনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। এ পল্লীর অধিবাসীরা যেন ভীতত্রস্ত···মোহনলালের মনে হইল, প্রত্যেক বিদেশীকে তাহারা যেন সন্দেহ ও ভীতির চোখে দেখিতেছে!

অদূরে সতুকে দেখা গেল। ভিতরকার একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া সে উঠান পার হইয়া তাহার দিকেই আসিতেছে। এমন সময়···

সশব্দে টিনের বাড়ীর ছাদ হইতে প্রকাণ্ড একটা ফুলের টব

মাটিতে পড়িল। পড়িল মোহনলাল ও সতুর মাঝখানে, আধ-হাতের ব্যবধানে সতুর মাথাটা বাঁচিয়া গেল! সতু লাফ দিয়া সরিয়া গেল—ভুমিকম্প হচ্ছে নাকি, স্যর! সতুর মুখে কৌতুকের ছায়া! ব্যাপারটাকে সে তলাইয়া দেখিল না। কিন্তু মোহন-লালের মুখ কঠিন; কহিল—অ্যাক্‌সিডেণ্ট্‌ নয় সতু; ইচ্ছে ক'রে এই টব ফেলা হয়েছে; লক্ষ্য ছিল তোমার মাথা, ফস্‌কেচে অল্পের জন্যেই। তারপর উপর দিকে চাহিয়া কহিল—চল তো, ছাদটা একবার দেখা যাক!

সতু পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। উভয়ে তীরবেগে সরু সিঁড়ি বাহিয়া টিনের বাড়ীর টিনের ছাদে উঠিয়া গেল। সতু পকেট হইতে টর্চ্চ বাহির করিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। কেহ কোথাও নাই। মোহনলাল প্রশ্ন করিল—তুমি ছাড়া এ হোটেলে আর কে আছে, জান?

সতু জবাব দিল—আর একজন বাসাড়ে আছে, কি যেন তার নাম,...শিবসদয়।

—হুঁ, সেই শিবসদয়কে একবার দেখতে হবে। আমাদের প্রতি তিনি বড় সদয় নন।

দ্বিতলের একটা ঘর দেখাইয়া সতু কহিল—এই ঘরে থাকে শিবসদয়।

—চল, ঢোকা যাক।

ঘরের মধ্যে একটা আমকাঠের টেবিলের উপর বাতি জ্বলিতেছে এবং তাহারই সম্মুখে বসিয়া একটি লোক চোখে

চশমা লাগাইয়া বই পড়িতেছে। লোকটির বয়স আন্দাজ চল্লিশ, ছাঁটা দাড়ি, ছোট ছোট চুল ; লোকটি যে বিশেষ বলিষ্ঠ তাহা এক নজরেই বোঝা যায়। মুখ তুলিয়া অপরিচিত মানুষ দেখিয়া ভুরু কুঞ্চিত করিয়া লোকটি কহিল—কে আপনারা ? কি চান ?

মোহনলাল কহিল—আপনি বোধ করি শিবসদয়বাবু ? লোকটি মাথা নাড়িলে মোহনলাল পুনশ্চ কহিল—ছাদের ওপর এইমাত্র কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন নাকি ?

লোকটি মাথা নাড়িয়া কহিল—না। আপনারা কে, কোথা থেকেই বা আসছেন ?

—আমরা এই কাছ থেকেই আসছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! এত জোর শব্দ হ'ল, অথচ আপনি মোটেই শুনতে পেলেন না !

মোহনলালের কথায় লোকটি কহিল—আমি বই পড়-ছিলাম···

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বইখানা আপনি উল্‌টো ধরেছেন।

মোহনলালের কথা শুনিয়া শিবসদয় চমকিয়া বইখানার পানে দৃষ্টিপাত করিল, তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—কে বললে উল্‌টো, সোজাই আছে !

উভয়ে ঘরের বাহিরে আসিলে মোহনলাল বলিল—বইটা সে সোজাই ধরেছিল, কিন্তু আমার কথা শুনে সে চম্‌কে উঠে

দেখতে বাধ্য হল, সত্যিই সোজা আছে, না উল্‌টো! এই আমাদের লোক সতু, ফুলের টব ওই লোকটাই ফেলেছিল।

* * * * *

ফেরার পথে ললিতের সঙ্গে দেখা হইল। ললিত এখানে আসিয়া তাহাদেরই সন্ধানে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। কহিল—এখানে আসবার আগে কলকাতায় আপনার বাড়ী গিছলাম মোহনবাবু। সেখানে আপনার চাকরের মুখে শুনলাম, আপনারা চলে এসেছেন। আপনার চাকর এই খামখানা দিলে, গভর্ণমেণ্টের নৌ-দপ্তর থেকে এসেছে! আপনারা বাড়ী থেকে বেরুবার পর বেহারা এসে দিয়ে যায়। দরকারী মনে ক'রে সঙ্গে এনেছি।

খামখানা হাতে লইয়া মোহনলাল কহিল—ভালই করেছেন। দেখা যাক, এর মধ্যে কি আছে।

ভিতর হইতে একখানি চিঠি ও একখানি ছবি বাহির হইল। চিঠিতে লেখা আছে: "লামডিং কোঠারির একখানা ছবি পাঠালাম। মানুষের কোন ছবি নেই। তবে তার চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব না থাকলেও বাঁ-কাঁধের উপর বড় একটা জড়ুল আছে—খাতায় তার নামের পাশে এই ধরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আশা করি, এই সংবাদ এবং এই ছবি তোমার কাজে লাগবে।"

ছবিখানার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া মোহনলাল কহিল—কোঠারিকে ভাল ক'রে দেখ সতু, আর শিবসদয়কে স্মরণ কর;

এই ছবিখানাতে ছাঁটা দাড়ি আর চশমা সংযুক্ত ক'রে দাও, তাহলেই শিবসদয়কে পাবে।

ছবিখানা মিনিট খানেক চোখের সামনে রাখিয়া সতু কহিল—আপনার কথা মিথ্যে নয়। লামডিং কোঠারি আর শিবসদয় একই লোক।

ছয়

নদীর ধারে জেটি-সংলগ্ন জাহাজ-আপিসের কামরায় এক ব্যক্তি গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। লণ্ঠনের আলোয় তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখা না গেলেও, যতটুকু দেখা যায়, তাহাতে বুঝিতে দেরী হয় না যে লোকটি বিশেষ চিন্তামগ্ন। তাহার অঙ্গে সাহেবী পোষাক; মুখে চুরুট। দীর্ঘ চেহারা, কর্ত্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক।

ইতিমধ্যে জাহাজ-আপিসটার কিছু কিছু সংস্কার হইয়াছে। ঘর-দুয়ার ঝাড়পোঁচ করিবার জন্য সাময়িকভাবে একটি পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছে। জেটির পাশে যে পুরাণো-ধরণের দোতালা ষ্টীমারখানা দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকেও ঝাড়পোঁচ করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করা হইয়াছে। এখানে নূতন যে জাহাজ-কোম্পানী আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহারই মালিক এই সমস্ত সংস্কার করাইয়াছে। জলের তলায় নামিবার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিও জাহাজে লাগানো হইয়াছে। গঙ্গার

মোহনায় বহু বছর আগে যে জাহাজ ডুবি হয়, তাহার ভিতরকার সম্পত্তি তাহারা উদ্ধার করিবে। আপিসঘরে এই কোম্পানীর মালিক শ্রীহন দারুক টেবিলের ধারে বসিয়া বোধ হয় ভবিষ্যত কার্য্যপ্রণালীর কথাই চিন্তা করিতেছে। না, আয়োজন যখন প্রস্তুত, তখন আর বিলম্ব করিয়া লাভ নাই। যত শীঘ্র জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া যায় ততই ভাল। বহু টাকা খরচ হইয়া গেছে, কিন্তু যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়…

চিন্তাসূত্রে বাধা পড়িল। কোঁস্তা হাতে নব-নিযুক্ত পরিচারিকা গয়লা-বৌ ঘরে ঢুকিল। ভুরু কুঁচকাইয়া দারুক কহিল—আমি তোমাকে পঞ্চাশবার বলেছি না যে যখন আমি ঘরে থাকবো, তখন ঘর সাফ করতে আসবে না।

ধূলিমলিন অপরিচ্ছন্ন চেহারা, মাথার চুল তেলের অভাবে শনের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তালি দেওয়া কাপড়, অনাহার-ক্লিষ্ট মুখের ভাব, কিন্তু তবুও বুঝিতে পারা যায়, গয়লা-বৌ মেয়েটি কুশ্রী নয় এবং ভাল আহার এবং পরিচ্ছদ পাইলে সে যে-কোন সমাজে চলিয়া যাইতে পারে।

মনিবের কথায় ঝি-টা কাঁচুমাচু মুখে করুণস্বরে কহিল—বাবু, আমি এ-বেলা ছুটি নিতে এসেছি; ছেলেটার জ্বর আবার বেড়েছে। কাশ্‌তেছে খুব, তাই…

—আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি যাও, এখন আর কোন কাজ নেই। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা'ও।

ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া গয়লা-বৌ দরজাটা

ভেজাইয়া দিল। পরক্ষণেই রমণীর মুখে আশ্চর্য্য ভাবান্তর ঘটিল। কোথায় গেল দুই চোখের সেই ক্লান্ত-কাতর অভিব্যক্তি, কোথায় গেল নীচ দাসীপনার ভাব, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সে বারেক চারিদিকে চাহিয়া লইল ; তারপর তাহার প্রদীপ্ত চোখে-মুখে এক প্রকার বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল।

* * * *

কিছুক্ষণ পরে আসিল সেই কান্‌চেপ্‌টা লোকটা। ভিতরে ঢুকিয়া দরজাটা সাবধানে বন্ধ করিয়া সেলাম করিল। দারুক কহিল—এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। খবর কি লেবং ?

কান্‌চেপ্‌টার আসল নাম কেহ জানে না। সকলে তাহাকে লেবং বলিয়া ডাকে। জাতে নেপালী। দারুকের প্রশ্নের উত্তরে কহিল—খবর ভাল নয়, কর্ত্তা, গোয়েন্দা বেটা এখনো বেঁচে আছে।

মোহনলালের বাড়ীর দরজার পাশে বোমা স্থাপনা এবং এখানে কিছুক্ষণ আগেকার মোটর চালনা—এ দুয়েরই নায়ক লেবং। কহিল—দু'দুবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাজ হল না।

তাহার প্রচেষ্টার বর্ণনা শুনিয়া দারুক জ্বলিয়া উঠিল, কহিল —এ বুদ্ধি তোমায় দিলে কে ?

লেবং উত্তর দিল—কেন, কোঠারি ! সে বললে, গোয়েন্দা

মোহনলালকে সরাতে হবে যেমন ক'রে হোক। তাই সেই চেষ্টা করলাম দু'বার।

লেবং-এর কথা শুনিয়া ভীষণ দাঁত খিঁচাইয়া দারুক কহিল—ভারী কাজ করেছো! এ দলের কর্ত্তা কে, আমি না কোঠারি? সে খোঁজ-খবর দিয়েছে বটে, আমরাও প্রায় সফল হবার কাছাকাছি এসেছি; কিন্তু টাকা খরচ করেছি অনেক। আমি চাই না যে, কাজের ভুলে সব পণ্ড হয়। আজ যদি মোহনলাল মারা পড়ত, তাহলে কি হ'ত বল দেখি! পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হ'য়ে যেতো; তারপর সন্দেহক্রমে ওরা যদি আমাদের গ্রেপ্তার করত, তখন? না, না, ওসব চলবে না। বহু লক্ষ টাকা আমাদের হাতের গোড়ায়, এ সময় বোকার মত কোন কাজ করা চলবে না। আমার অমতে কোন কাজ হবে না। বলে দিও কোঠারিকে! আমি চাই না···

কথা বলিতে বলিতে দারুক থামিয়া গেল। পিছনে ও কিসের শব্দ! পাশাপাশি দুইটা ঘরের মাঝখানে একটা পুরানো বড় দেরাজ-আল্‌মারি; শব্দটা তাহারই পাশ হইতে আসিল! আলমারির সামনে একখানা পরদা ঝুলিতেছিল। দারুক মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া থাকিয়া অগ্রসর হইয়া পরদাখানা সরাইয়া ফেলিল! বিচিত্র ব্যাপার! পরদার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে, নব-নিযুক্ত পরিচারিকা গয়লা-বৌ! লেবং বিস্ময়ে অস্ফুট উক্তি করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে দারুকের মুখে হিংস্র ক্রোধ ফুটিয়া উঠিল।

দাঁতে দাঁত ঘসিয়া কহিল—গুপ্তচর! আমাদের সব কথা শুনেছে!

শান্তকণ্ঠে রমণী উত্তর দিল—শুনেছি! আমার যা জানবার ছিল জেনে নিয়েছি। কেন তোমরা এখানে এসেছো তা জানতেই আমার আসা।

বিকৃতস্বরে দারুক কহিল—এসেছো বটে। কিন্তু ফেরবার পথ নেই। হত্যা আমি চাই না! কিন্তু এ-ক্ষেত্রে উপায় নেই। লেবং, ধর ওকে!

লেবং এতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়াছিল। এইবার তাহার চোখমুখ কঠিন হইয়া উঠিল। একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া সে রমণীর দিকে অগ্রসর হইল।

—প্রাণের মায়া যদি থাকে, তাহলে আর এক পা এগুনো চলবে না! রমণীর কণ্ঠস্বর স্থির অকম্পিত।

উভয়ে সবিস্ময়ে ও সভয়ে দেখিল, তাহার হাতে একটা কালো পিস্তল! রমণী কহিল—বুঝতেই পারছো তোমরা, আসলে আমি ঝি নই এবং এত দূর যখন এগিয়েছি, তখন গুলি করতেও দ্বিধা করব না। অতএব, পেছিয়ে যাও, পেছিয়ে যাও বলছি।

লেবং পিছাইয়া গেল। রমণী আবার কহিল—খবরদার, এগিয়েছো কি গুলি করব!……তাহলে আজকের মত বিদায়, মিঃ তিনমুদু বসাক, আশা করি আবার দেখা হবে!

রমণীর মুখে 'তিনমুদু বসাক' নাম শুনিয়া দারুক চমকিয়া

উঠিল। ইতিমধ্যে আলমারির পাশ হইতে রমণী অদৃশ্য হইয়াছে। অন্ধকারের ভিতর হইতে তাহার বিদ্রূপাত্মক হাসির ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থাকিয়া অস্ফুটকণ্ঠে দারুক বলিল—মেয়েটা কে? কেমন ক'রে জানলে এ নাম! ও কি গোয়েন্দা মোহনলালের গুপ্তচর!

এইবার লেবং কথা কহিল; বলিল—তা কেমন ক'রে হবে? মেয়েটা তো আজ পনেরো দিন হ'ল এখানে কাজ করছে। মোহনলাল গোয়েন্দা খবর পেয়েছে মাত্র কাল!

দারুক তাহার পানে চাহিল। কহিল—হুঁ। কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে আসছে লেবং! তার আগেই কাজ শেষ করা চাই।

সাত

ললিতের এখানে আর কোন কাজ ছিল না। কাজের সময় মোহনলাল বাহিরের লোক লইয়া ভীড় বাড়াইতে চাহে না; তাই ললিতকে বিদায় দিল। এলাহি কাদেরের হোটেলে ভীড় জমিয়াছে; গ্রামের লোক নয়। ইহারা সেলার, লস্কর, খালাসীর দল; সম্ভবত নূতন জাহাজে কাজ লইয়াছে। নূতন জাহাজ কোম্পানীর মালিকের নাম জীহন দারুক। অদ্ভুত নাম। লোকটার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইতে হইবে। মোহনলাল সতুকে লইয়া হোটেলের ভিতর ঢুকিল। খালাসীগুলার অবস্থা অতিশয় আতঙ্কদায়ক; প্রত্যেকেই মদ খাইয়াছে এবং মাতলামী সুরু

করিয়াছে। হোটেলওয়ালা কাদের একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার এমন সাহস বা ক্ষমতা নাই যে ইহাদের নিষেধ করে বা নিবৃত্ত হইতে বলে। মোহনলাল ও সতুকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা রক্তবর্ণ চোখে দু'জনকে বিশেষ করিয়া মোহনলালকে দেখিতে লাগিল; একটা নিগ্রো বিশালকায় এক মগের সহিত ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বোধ হয় মোহনলালের সম্বন্ধেই কি বলিতে লাগিল। এমন সময় পাশের মুদির দোকান হইতে দোকানের মালিক একটি গেলাস হাতে করিয়া চা কিনিতে ঢুকিল; বেঁটে মানুষটি, নিতান্ত গোবেচারা। স্পষ্ট দেখা গেল, এই সব মাতাল লস্করদের কাছে আসিতে সে ভয় পাইতেছে। চা লইয়া মুদি বাহির হইয়া যাইবে, এমন সময় অকস্মাৎ এক কাণ্ড বাধিল। নিগ্রোটা হাত বাড়াইয়া খপ্‌ করিয়া মুদির একখানা হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া কহিল—এই যে মুদিভাই! সুড়সুড় ক'রে পালাচ্ছো কেন বাবা! এসো, এক পাত্র হোক!

মুদি বেচারা কাঁপিতে লাগিল—না, না, আমায় ছেড়ে দিন; আমি খাই না, আমি···

কিন্তু কে শোনে কার কথা! ততক্ষণে মগ-মাতালটা মুদির গেলাস লইয়া চা খাইয়া ফেলিয়াছে এবং সেই গেলাসে খানিকটা মদ ঢালিয়া নিগ্রো তাহাকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে! হঠাৎ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ছেড়ে দাও ওকে! ছেড়ে দাও এখনি।

সকলে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মোহনলাল নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; কহিল—এটা মগের মুলুক নয়! জুলুম চলবে না। বেয়াদব কোথাকার। বলিয়া মগটাকে সরাইয়া দিয়া মুদিকে মুক্ত করিয়া কহিল—যাও, তুমি বাড়ী যাও।

বন্ধুর লাঞ্ছনায় রাগে ফুলিতে ফুলিতে নিগ্রো উঠিয়া দাঁড়াইল; একে বর্ব্বর নিগ্রো, তায় মাতাল, সুতরাং তাহার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকিবার কথা নহে; হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিল—তুম্ কোন্ হ্যায়?

ধীরস্বরে মোহনলাল কহিল—বেশি চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না। যেমন আছ তেমনি থাক। বেকুফ কাঁহাকা!

ব্যস, বারুদে যেন আগুনের ফুল্‌কি পড়িল। দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া নিগ্রোটা মোহনলালের দিকে ধাইয়া আসিল। মোহনলাল প্রস্তুত হইয়া ছিল; ইহাদের নিকট সহসা এরূপ আক্রমণ অপ্রত্যাশিত নহে; সে ঈষৎ পিছন দিকে হেলিল, তারপর উন্মত্ত লোকটা নাগালের মধ্যে আসিবামাত্র তাক্ করিয়া ঘুসি চালাইল; ঘুসিটা গিয়া পড়িল নিগ্রোর কানের পাশে রগের উপর, অর্থাৎ যেখানে পড়িলে আর দ্বিতীয়বার ঘুসি চালাইবার প্রয়োজন হয় না। দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা মোহনলালের ঘুসি চালাইবার কলকৌশল বিলক্ষণ আয়ত্ত ছিল। এক ঘুসিতেই অত বড় যোয়ান নিগ্রোটা ছিট্‌কাইয়া পড়িল এবং এক কোণে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। মগটাকে উদ্দেশ করিয়া মোহনলাল কহিল—এবার তুমি আসবে নাকি? উত্তরে লোকটা

বেঞ্চি ডিঙাইয়া সকলের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। মোহনলাল আবার কহিল—আমি সকলকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি! নিরীহ মানুষদের সঙ্গে এমনধারা ব্যবহার চলবে না এখানে! গুণ্ডামি সায়েস্তা করবার কায়দা আমরা জানি। তথাপি লোকগুলা কোন কথা কহিল না; হাজার গুণ্ডা হইলেও, কোন শক্তিমান মানুষের সাম্নে পড়িলে তাহাদের ভিতরকার কাপুরুষতা ফুটিয়া উঠিতে দেরী হয় না। লোকগুলা আড়ষ্টভাবে এক পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। সতুকে লইয়া মোহনলাল হোটেলের বাহিরে আসিল।

রাত বেশী হয় নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামের নিশুতি পথ জনহীন। শুক্লপক্ষ। চাঁদের আলোয় অন্ধকার ততখানি গাঢ় বোধ হইতেছে না। নদীর উপর দিয়া মাঝে মাঝে দু'একখানা ছোট নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে। নূতন জাহাজ কোম্পানীর জাহাজে আলো জ্বলিতেছে এবং বড় নল দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। রাত্রে ষ্টীমার ছাড়িবে নাকি? মোহনলাল ও সতু পাশের মুদির দোকানের সামনে থামিল। মুদি তখন দোকান বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে; মোহনলালকে দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া কহিল—বাবুমশায় আজ আমার জাতমান রক্ষে করেছেন; কিন্তু বাবুমশায়, ওরা যদি আবার আমায় ধরে…

লোকটি অতিশয় ভয় পাইয়াছে; সাহস দিয়া মোহনলাল কহিল—ধরলেই হল আর কি! এ কি অরাজক? পুলিশ নেই!

—আজ্ঞে, বাবুমশায় এখানে আর পুলিশ কোথায়? হোই উলুবেড়ের রাস্তায় একটা টহলদার থাকে, সে-ও তো ভয়ে এ

তল্লাট মাড়ায় না। সকলের সঙ্গে ওরা ঝগড়া বাধায়। ওঁরা আজ সাত-আটদিন এখানে এসেছে ওই ইষ্টিমারে ক'রে! সকলের ওপর এই রকম জুলুম জবরদস্তি বাবু। ঝিল্লো নিয়ে বাস করা দায় হ'ল। এই তো সেদিন, যেদিন রাত্রে ললিতবাবুর বাড়ীতে ওঁর বন্ধুরা খেয়েদেয়ে গেল, সেদিন আমার ভাগ্নে গুপীনাথ গোরস্থানের ভিতর দিয়ে আসছিল; ওরা ছিল বুঝি সেখানে। নাহক, গুপীনাথকে ধ'রে আধমরা ক'রে দিলে!

কৌতূহলী মোহনলাল কহিল—এখানে আবার গোরস্থান আছে নাকি? কোথায়?

হাত দিয়া গঙ্গার ধারের দিকে পশ্চিম ঘেঁসিয়া একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মুদি কহিল—ওই যে বড় বড় নারকেলগাছ দেখা যাচ্ছে, ওরই নীচে; অনেকদিনের পুরণো গোরস্থান, অনেক খিরিশ্চান, মুসলমানের কবর আছে।

কি একটা কথা মনে করিয়া মোহনলাল ঈষৎ অন্যমনস্ক হইল। কিছুক্ষণ পরে মুদির নিকট বিদায় লইয়া মোহনলাল গঙ্গার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সতু কহিল—চলুন, ফেরা যাক এইবার।

মোহনলাল কহিল—পরে। আগে একবার গোরস্থানটা দেখে আসি চল।

আট

খালাসী এবং লস্করগুলা বোধ হয় জাহাজে ফিরিয়া গেল। মোহনলাল সতুকে লইয়া সকলের অলক্ষ্যে নদীর ধার দিয়া

গোরস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিল। একে নিঝুম রাত, তায় চতুর্দ্দিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ। দূরে একটা বড় শিমূল গাছের ভিতর হইতে খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দে বোধ হয় পেঁচা ডাকিল। দূরে তক্ষক শব্দ করিতেছে, যেন মানুষে গলা খাঁকারি দিতেছে! শ্রীকান্তের শ্মশান-অভিযানের কথা সতুর মনে পড়িল, একলা হইলে সে ভয় পাইত নিশ্চয়।

টর্চ্চের আলোয় দেখা গেল, ঘাসের উপর দিয়া একটি পায়েচলা পথ এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত চলিয়া গেছে; মোহনলাল সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। আশেপাশে ছোটবড় নানা আকারের কবর। কতকগুলা বা শুধু মাটির ঢিবি! একস্থানে আসিয়া মোহনলাল থামিল।...পায়ের কাছে সেই স্থানের নরম ঘাস ও মাটি যেন চসিয়া ফেলা হইয়াছে; জুতার দাগ স্পষ্ট। মোহনলাল চতুর্দ্দিকে আলো ফেলিতে লাগিল। অদূরে একটা ইংরাজের কবর; মাটির নীচে ঘর, তাহার ছাদ ও দরজা অবশ্য মাটির উপরে; পুরাণো কবর, চারিদিকে ঝোপ ঝাড় আর আগাছা। মোহনলাল সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেল। দরজার গায়ে দুইটা কড়ার মাঝখানে তালা ঝুলিতেছে। তালার উপর টর্চ্চের তীব্র আলো পড়িতেই মোহনলালের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইল, কহিল—সতু, দেখেছো!

সতু তাহার পাশে আসিল। মোহনলাল কহিল—তালার ছেঁদার আশেপাশে ঘসা দাগ, যেন কোন যন্ত্রদ্বারা তালাটাকে সম্প্রতি খোলা হয়েছে!

—তাই তো দেখছি। বলিয়া সতু কাছে গিয়া তালাটাকে ধরিয়া নাড়া দিতেই, তাহা খুলিয়া গেল। মোহনলাল বলিল—জোর ক'রে তালাটাকে যারা খুলেছিল, তারা বন্ধ করতে পারেনি। খোল দরজা।

সতু তালাটাকে খুলিয়া দরজা ঠেলিল। জীর্ণ জারুল কাঠের পাল্লা-দু'খানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিতে করিতে খুলিয়া গেল। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্যাঁতা উৎকট গন্ধ।

টর্চ্চের প্রখর আলো সেই অন্ধকারের বুক ভেদ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল ও সতু উভয়ের মুখ দিয়াই অস্পষ্ট বিস্ময়োক্তি নির্গত হইল···সাম্‌নেই দেওয়াল ঠেস দিয়া একটা মৃতদেহকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে···বাসি শবদেহে পচ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে···চারিদিকে দুর্গন্ধ···মৃতদেহের অঙ্গে জাহাজের লস্করের পোষাক, হাতে নানাবিধ উল্‌কি···মোহনলাল মৃতদেহের কাঁধ হইতে জামাটা সরাইয়া দিল···বাঁ-কাঁধে বড় একটা জড়ুল!···বুকের কাছে একটা প্রকাণ্ড ক্ষত···ক্ষতের মুখে রক্ত শুকাইয়া কালো হইয়া গেছে···নিরুদ্দিষ্ট মানুষের মৃতদেহ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

—গুপীনাথ নামে লোকটার ওপর আক্রমণ হয়েছে শুনেই আমার সন্দেহ হয়, হয়ত খালাসীগুলো এখানে কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিল, এমন সময় লোক আসাতে তারা বিচলিত হয় এবং

তাকে মারধোর ক'রে তাড়ায়। মোহনলাল বলিতে লাগিল —ললিত তার বাড়ীর বাগানে মৃতদেহটা দেখবার পর গুপীনাথের ওপর আক্রমণ হয়; তার দ্বারায় দু'টো ঘটনাকে যুক্ত ক'রে যে অনুমান আমার মধ্যে উদয় হয়, তা যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ চোখের সামনে। এখন কথা হচ্ছে, মানুষকে খুন করলে কে এবং কেনই বা করলে। এ বিষয়ে লামডিং কোঠারি ওরফে শিবসদয় আমাদের সাহায্য করতে পারে, কিন্তু লোকটাকে সহজ উপায়ে হস্তগত করা মুস্কিল। গ্রেপ্তার করানো যেতে পারে তাকে, কিন্তু তাতে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হবে না এবং আমার মৃত্যু-পণ হয়ত শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করা যাবে না। তাই গ্রেপ্তার এখন নয়। তার চেয়ে···

একটা তীক্ষ্ণ সোঁ সোঁ শব্দ ভাসিয়া আসিয়া মোহনলালের কথা বন্ধ করিয়া দিল। সতু কহিল—ও কিসের শব্দ? গঙ্গার ধার থেকে ভেসে এলো।

কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া মোহনলাল কহিল—জাহাজে ষ্টীম দিয়েছে। তার মানে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বোধ হয় জাহাজখানা ছাড়বে। চলে এসো।

কবরঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মোহনলাল ক্ষিপ্রপদে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। সতু তাহার পিছনে। ক্রমে তাহারা গঙ্গার ধারে আসিল। সতু কহিল—এখন কোথায় যাবেন?

—এখন? মোহনলালের দৃষ্টি সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ—এখন আমি যাব ঐ জাহাজে।

—বলেন কি! জাহাজের মধ্যে ওরা বহু লোক। বিপদ কাটানো যাবে না। ঘাড নাড়িয়া সতু কহিল—আপনি গেলে আমিও যাব।

গম্ভীরগলায় মোহনলাল বলিল—আমি একলা থাকলে বিপদ কম হবে! আমার বিবেচনায় এ-ক্ষেত্রে আমি একাই যাব। তুমি বাকী রাত এখানেই অপেক্ষা কর।

সতু দু'একবার জেদ করিল, কিন্তু সে জানে যে মোহনলাল যাহা একবার স্থির করে, তাহার নড়চড় হয় না। তাই শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ অন্তরে নীরব হইয়া রহিল। কাদেরের হোটেল হইতে খালাসী ও লস্করগুলা ইতিমধ্যে জাহাজে চলিয়া গেছে। উপরকার ডেকে দু'একটা আলো জলিতেছে; নীচেকার ডেক অন্ধকার। মোহনলাল জেটির উপর দিয়া না গিয়া তাহার তলা দিয়া জলের কাছ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেল। জেটির পাটাতনের তলা দিয়া মোটা মোটা লোহার রড্ চলিয়া গেছে; সেই রড্ ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে জলপথটুকু পার হওয়া শক্ত নয়। কিন্তু তারপর? জেটির উপর উঠিয়া জাহাজে যাইবার সময়, অন্ধকার হইলেও, দেখিয়া ফেলা অসম্ভব নয়, এবং একবার যদি কেহ তাহাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলেই সব মাটি! কিন্তু এ-ছাড়া অন্য পথ আর নাই। সতুকে পরামর্শ এবং নির্দ্দেশাদি প্রদান করিয়া মোহনলাল ধীরে ধীরে জেটির নীচে নামিয়া গেল।

জাহাজের উপর লোক চলাচলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। খালাসীগুলা নীচে নামিয়া গেছে। ব্রিজের উপর সারেঙের

ঘরে মৃদু নীল আলো জ্বলিতেছে। জাহাজের সম্মুখের দিকে দু'একজন খালাসী কাজ করিতেছে···

লোহার পাইপ বাহিয়া মোহনলাল জেটি-সংলগ্ন পন্টুনের উপর উঠিল। তারপর সেখান হইতে জাহাজে যাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।···কিন্তু জেটির উপর ও কিসের শব্দ? সাবধানে মুখ তুলিয়া দেখিয়া মোহনলাল অবাক হইয়া গেল! অন্ধকারে একজন গুড়ি মারিয়া ষ্টীমারের দিকে যাইতেছে, এবং সে-ব্যক্তি স্ত্রীলোক···চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে রমণী ষ্টীমারের পিছনদিকে, যেদিকে কোন লোকের চিহ্ন ছিল না, সেইদিকে উঠিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।···বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে, মোহনলাল দেখিল, তাহারও এই সুযোগ; খালাসী দু'জন নীচে নামিয়া গেছে; ডেকের উপর কেহ নাই। মোহনলালও রমণীর মত গুড়ি মারিয়া জাহাজের পিছন দিকে উঠিল। সে-দিকটায় দড়িদড়ার স্তূপাকার। একপাশে কাঠের তক্তার উপর তারপলিন-ঢাকা একখানা জালিবোট। রমণীর কোন চিহ্ন নাই। মোহনলাল সেই জালিবোটের খোলের মধ্যে নামিয়া নিজের মাথায় তারপলিন্ চাপা দিল।

জাহাজের এন্‌জিন্ ঘরে ঝক্‌ঝক্ শব্দ হইতেছে। এখনি বোধ হয় জাহাজ তাহার যাত্রা সুরু করিবে। একটু পরেই খালাসীরা উপরে আসিয়া দড়িদড়া টানাটানি করিতে লাগিল। একটা অতিকায় খালাসী, বোধ হয় দলের সর্দার, জালিবোটের কাছে দাঁড়াইয়া অন্যান্য খালাসীদের হুকুম দিতে লাগিল।

নয়

দলপতি দারুক এবং তাহার সঙ্গে লেবং সব শেষে জাহাজে আসিল। জাহাজ চালানোর ভার লেবংএর উপর। দারুকের প্রশ্নের উত্তরে সে জানাইল, সমস্তই প্রস্তুত; পাঁচ মিনিটে জাহাজ ছাড়িবে। জাহাজে উঠিয়া দারুক রেলিং ধরিয়া নদীর দিকে চাহিয়া লেবংএর সহিত কথা বলিতে লাগিল। জালি-বোটখানা বেশী দূরে নয়। মোহনলাল কান খাড়া করিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছে···দারুকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার কৌতূহলের অবধি নাই! স্মৃতির দ্বারে আসিয়া সে কণ্ঠস্বর বারবার ধাক্কা দিতেছে···ইতিপূর্ব্বে কোথায় এ স্বর সে শুনিয়াছে ···কে সে?···কোথায়? কিছুক্ষণ পরে লেবং নিজের কাজে চলিয়া গেল। কোঠারি আসিয়া কহিল—সমস্ত প্রস্তুত। জাহাজ ছাড়ুক?

দারুক ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে নিজের কেবিনের দিকে চলিল। জাহাজ-আপিসের ঘটনাটা তখনো তাহাকে আলোড়িত করিতেছিল···কে ওই রমণী···তাহার আসল পরিচয়ই বা সে কেমন করিয়া পাইল···এ যে স্বপ্নেরও অগোচর···দারুকের ধারণা ছিল, তাহার নব-জন্মলাভের পর এ পৃথিবীতে কেহ আর তাহাকে চিনিতে পারিবে না। কিন্তু···

কেবিনের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া দারুক বারেক জাহাজখানার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া লইল। অল্প সময়ের মধ্যে ষ্টীমার-

খানিকে মন্দ সংস্কার করা হয় নাই। তাহার কেবিনের দেওয়ালেও নূতন করিয়া রং দেওয়া হইয়াছে। লেবং কাজের লোক বটে। এ পর্য্যন্ত কোনদিকে কোন ত্রুটি হয় নাই।

কেবিনের বন্ধ দরজার হাতল ঘুরাইয়া দারুক ভিতরে ঢুকিল।···তাহার কানে আসিল, শান্তকণ্ঠে কে বলিতেছে— আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি!

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। চমকিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দারুক দেখিল, কেবিনের একধারে দড়ির ইজিচেয়ারে বসিয়া আছে একান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে, হাসিমুখে—জাহাজ অপিসের ঝি গয়লা-বৌ।

জীবনে অনেকবার অনেক প্রকারের বিস্ময়োৎপাদক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে দারুক, কিন্তু ইহা যেন সকলের উপর টেক্কা দিল! বিস্ময় তাহার অসহ্য···সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না···গয়লা-বৌ এখন আর ঝিয়ের বেশে নয়; অঙ্গে তাহার ঝলমলে জ্বলজ্বলে পোষাক, ঝক্‌ঝকে চটি পায়ে, তক্‌তকে চুলের পারিপাট্য আর সর্ব্ব অঙ্গের শোভা!! জীহন দারুক ভূতগ্রস্তের মত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মিষ্টমৃদুকণ্ঠে রমণী কহিল—ভয় পাবেন না! আমি ভূতপ্রেত নই; মানুষ!

কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া দারুক কহিল—কে তুমি? কী সাহস আর অস্পর্দ্ধা তোমার!

উত্তরে রমণী মুচকি হাসিয়া কহিল—সাহস কিছু আছে বৈকি! অস্পর্দ্ধার কথা আপনিই বলতে পারেন!

—এখানে এসেছো কেন? কি চাও তুমি?

সহজভাবে রমণী কহিল—নদীর তলা থেকে যে সোনা তুলবেন, তারই কিছু ভাগ চাই!

কি একটা কথা বলিতে গিয়া দারুক থামিয়া গেল, তারপর অন্যস্বরে বলিল—তোমার জানা দরকার, বাঘের গর্ত্তে ঢুকেছো তুমি! এখানে তোমায় কেটে কুচি কুচি ক'রে রাখলেও কেউ বলবার নেই।

বাঁকা হাসি হাসিয়া রমণী বলিল—তা আমি জানি। সে সম্বন্ধে আমি কি ব্যবস্থা করেছি, তাও বলি। কলকাতায় আমার এক বিশ্বস্ত এটর্ণীর কাছে আমি একখানি গালা-আঁটা খাম রেখে এসেছি। ব্যবস্থা হয়েছে এই যে, আমি প্রত্যেক সপ্তাহে তাদের জানাবো যে আমি বেঁচে আছি এবং সুস্থ আছি, যদি কোন সপ্তাহে চিঠি না যায়, তাহলে এটর্ণীরা সেই খামখানি পুলিশের স্পেশাল বিভাগের ইনস্‌পেক্টার কবীরের হাতে সমর্পণ করবে। সেই খামের মধ্যে জীহন দারুক নামে একটি লোকের সম্বন্ধে আমি যা জানি, সব কথা লেখা আছে। তার পূর্ব্ব পরিচয়, তার প্রকৃত পরিচয়, তার কীর্ত্তিকলাপ, বর্ত্তমান পরিকল্পনা—সমস্ত। সেই লেখা ইনস্‌পেক্টারের বিশেষ কাজে লাগবে বলেই মনে করি।

দারুক অভিভূত। মেয়েটা বলে কি! ক্ষণকাল পরে সজোরে কহিল—যত সব গাঁজাখুরি! তুমি প্রলাপ বকছ।

পূর্ব্ববৎ রহস্যময় হাসি হাসিয়া রমণী কহিল—গাঁজাখুরি নয়, বন্ধু; সর্ব্বৈব সত্য। প্রলাপ নয়, মোটেই নয়। তাহলে আরও

বিশদ ক'রে বলি শুনুন ! কিছুকাল আগে বাংলা দেশে এক দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত ছিল, পুলিশ যাকে কিছুতেই এঁটে উঠ্তে পারতো না। একবার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং পোর্ট ব্লেয়ার দ্বীপে চালান ক'রে দেয়। সেখান থেকে সেই ডাকাত কোন রকমে চার-পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে পালায় এবং একটা জাহাজে উঠে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। সেই জাহাজে আগুন লেগে যায় এবং খালাসী আর অফিসাররা পুড়ে মরে যায়। ডাকাতটিও পুড়ে গিছলো খুব কিন্তু মরেনি। কোন রকমে রেঙ্গুন পৌছে, সে সেখানকার এক জেলফেরৎ ডাক্তারের আশ্রয় পায় ; অস্ত্রচিকিৎসায় সেই ডাক্তার ছিল অসাধারণ দক্ষ ! ডাকাতের সমস্ত মুখখানা পুড়ে গিছল। ডাক্তারির গুণে সেই মুখ সেরে গেল বটে, কিন্তু আগেকার চেহারা আর ফিরলো না ; মুখখানা সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে গেল। তাতে সুবিধেই হল ডাকাতের। অন্য একটি নাম নিয়ে সে আবার তার কাজ সুরু করলে।

শুষ্ককণ্ঠে দারুক কহিল—তোমার গল্প শুনতে বেশ লাগছে। কিন্তু এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ?

—বিশেষ সম্পর্ক আছে। রমণী কহিল—সেই ডাকাতের নাম তিনমু বসাক এবং সেই তিনমু বসাক-ই বর্ত্তমানে জীহন দারুক।

দারুক যেন তড়িতাহত। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ননেত্রে রমণীর পানে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল—কিন্তু এ কথা সেই ডাক্তার ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না। তুমি জানলে কেমন করে ?

—আমি তখন সেই ডাক্তারের কাছেই যে কাজ করতাম! চোরাই ওষুধের ব্যবসা ছিল ডাক্তারের, আমি ছিলাম তার প্রধান সহায়। আমার নাম সোহিনী। পুলিশের খাতায় অনেকবার আমার নাম লেখা হয়েছে। আপনার মুখ সারবার পর আপনি যখন নবরূপ ধারণ ক'রে রেঙ্গুন পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি আপনাকে দেখেছিলাম। কিছুদিন পরে রেঙ্গুন অসহ্য হ'ল। এলাম কলকাতায়। দেখলাম আপনাকে একেবারে যাকে বলে, রাজবেশে। দেখামাত্র মনে হল, কাজ যদি করতে হয় এমনি লোকের সঙ্গে। তখন থেকে আপনার পিছনে পিছনে ঘুরছি, ছায়ার মত।

সোহিনী নীরব হইল। দারুকের মুখেও কথা নাই। অপূর্ব্ব এবং আশ্চর্য্য এই মেয়ে। ইহাকে বাগাইতে না পারিলে কাজ হইবে না। কহিল—সোহিনী! খুব চালাক মেয়ে তুমি! কিন্তু ভাবছি, এ-কাজে তুমি আমায় কি-ভাবে সাহায্য করতে পারবে?

এমন সময় দারুকের কেবিনের বাহিরে একটি লোক এধার হইতে ওধারে যাইবার সময়, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, দারুকের কেবিনের মধ্যে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর! কেবিনের একস্থানে কাঠের জোড়ের মধ্যে ফাঁক ছিল। লোকটি সেই ফাঁকের উপর কান রাখিয়া শুনিতে লাগিল।···সোহিনী বলিতেছে—অনেক কাজে লাগতে পারি। আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে অসাধ্য সাধন করা যাবে।

দারুক কহিল—বর্ত্তমানে যে কাজ হাতে নিয়েছি, তার যা

কিছু লাভ তা ভাগ হবে তিনজনের মধ্যে। লেবং, কোঠারি আর আমি। এর মধ্যে তোমার স্থান কোথায়?

—চতুর্থ ভাগ আমার। মৃদু হাসিয়া সোহিনী কহিল—শুধু তাই নয়। ভবিষ্যতে যে কাজ করব, তাতে 'মাত্র দুটো ভাগই থাকবে। বর্ত্তমানে কত টাকা?

দারুক কহিল—আন্দাজ দশ লক্ষ টাকা। পনেরো বছর আগে কলকাতা থেকে দশ লক্ষ টাকার গিণি নিয়ে একখানা জাহাজ ছাড়ে। গন্তব্য স্থান ছিল রেঙ্গুন। কিন্তু রেঙ্গুন পৌছুতে পারেনি। কাকদ্বীপের কাছে জাহাজখানা হঠাৎ ডুবে যায়। অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত তার সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি কোঠারি নামে এক পলাতক লস্কর আমাকে এই সন্ধান দিয়েছে। ডুবুরির কাজে সে ওস্তাদ। একটা ছোট কাজে সে কিছুদিন আগে জলের নীচে নেমেছিল। হঠাৎ সে সন্ধান পেয়েছে সেই জাহাজের। গভর্ণমেণ্টের কাছে এ-সংবাদ না দিয়ে সে আমার কাছে এসেছে। লেবং জুগিয়েছে জাহাজখানা। টাকা খরচা সব আমার। গিণি তোলা হলে তিন ভাগ হবে।

কেবিনের বাহিরে দাঁড়াইয়া যে লোকটা শুনিতেছিল, তাহার চোখমুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একটা অজ্ঞাতকুলশীল নারীর কাছে সব কথা ফাঁস হইয়া গেল!

কিছুক্ষণ পরে সোহিনী দারুকের মুখের উপর তাহার স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল—অপরকে ভাগ দেবার দরকার কি! দু'ভাগ হ'ক না। একভাগ তোমার, একভাগ আমার।

দারুক চমকিয়া উঠিল। এ কী বলিতেছে সোহিনী! কিন্তু ...হ্যাঁ, নয়ই বা কেন? সুবিধা পাইলে তাহারাই কি তাঁহাকে ছাড়িবে...সোহিনী দারুককে জয় করিল।

কেবিনের বাহিরে যে লোকটা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দাঁতে দাঁত ঘসিয়া সে নিঃশব্দে অদৃশ্য হইল। তাহার মাথায় তখন খুন চাপিয়াছে!

দশ

ধীরে ধীরে ষ্টীমার ছাড়িল, তারপর তাহার গতি বাড়িল। তারপলিন-ঢাকা অবস্থায় মোহনলাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। জাহাজ দক্ষিণদিকে যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে মোহনলাল কোন হদিসই পায় নাই। দারুকের কণ্ঠস্বর তাহার স্মরণ-শক্তিকে ধাক্কা দিয়া গেছে। নিশ্চয় সে এই কণ্ঠস্বর ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছে। লোকটাকে একবার নিজের চোখে দেখা দরকার!

তারপলিনখানা খুলিয়া মোহনলাল উঠিয়া বসিল। সন্তর্পণে বোট হইতে নামিতে যাইবে, এমন সময় সভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার সামনে ডেকের উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেই মগ লস্করটা এবং অবাক হইয়া লস্করটা তাহাকেই দেখিতেছে!

নিমেষে বুঝি সব ফাঁসিয়া গেল। লোকটা এখনি চীৎকার করিয়া উঠিবে, এবং...। মোহনলাল সহসা প্রচণ্ড জোরে লস্করটার

মুখের উপর ঘুসি মারিয়া বসিল···বোটের ভিতর হইতে মোহনলালকে উঠিতে দেখিয়া লস্করটা এত বিমূঢ় হইয়াছিল যে সে কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এমন সময় অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মত ঘুসি খাইয়া সে ছিট্‌কাইয়া দড়িদড়ার স্তূপের মধ্যে পড়িল। মোহনলাল লাফাইয়া পড়িল একেবারে তাহার ঘাড়ের উপর। লোকটা চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই মোহনলালের পিস্তলের বাঁট সজোরে তাহার কপালের উপর লাগিল! লোকটা টুঁ-শব্দ করিবার পূর্ব্বেই সংজ্ঞা হারাইল।

মোহনলাল সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বাঙ্গ তাহার ঘামে ভিজিয়া গেছে। চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। নাঃ, এদিকটায় কেহ বড় আসে না; কাহারো এখন আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াও মনে হয় না! লস্করটাকে টানিয়া তুলিয়া অতিকষ্টে তাহাকে জালিবোটের মধ্যে স্থাপন করিয়া মোহনলাল হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু এইবার···

অদূরে ভারী পদশব্দ! মোহনলাল চমকিয়া একটা কাঠের দেওয়ালের পিছনে আত্মগোপন করিল। সম্মুখে মাথাসমান উঁচু কাছির স্তূপ; তার উপর সেখানটায় আলোর লেশমাত্র নাই, খালাসীটা মোহনলালকে দেখিতে পাইল না। জাহাজের পিছনকার ল্যাম্প ঠিকমত জ্বলিতেছে কি না পরীক্ষা করিয়া যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

চারিদিকে অগাধ জলরাশি; তাহারই ভিতর দিয়া জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে। জাহাজে সে একা। কোনক্রমে তাহার

উপস্থিতি জানিতে পারিলেই এক সঙ্গে অন্ততঃ পঁচিশজন লোক তাহাকে আক্রমণ করিবে; অথচ পলায়নের পথ রুদ্ধ! মুহূর্ত্তের জন্য মোহনলালের মনে হইল, এ-ভাবে একাকী ষ্টীমারে আসা—কাজটা হয়ত বুদ্ধিমানের মত হয় নাই।

জাহাজের মধ্যে আলোর অপ্রাচুর্য্য থাকায় তাহার কিছু সুবিধা হইয়াছিল; অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া মোহনলাল নিঃশব্দ পদক্ষেপে কেবিনের দিকে অগ্রসর হইল…খস্ খস্ খস্ খস্… সন্তর্পণে কে যেন আসিতেছে…সিঁড়ির উপর মানুষের ছায়া… মোহনলাল সরিয়া দাঁড়াইল…এক ব্যক্তি উপরে উঠিয়া সারেঙের ঘরের দিকে চলিল…আবছা আলোকেও মোহনলাল তাহাকে চিনিল, শিবসদয় ওরফে কোঠারি! সিঁড়ির উপর উঠিয়া কোঠারি যেন কাহার সহিত কথা বলিতেছে…মোহনলাল উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লেবং প্রশ্ন করিল—ব্যাপার কি কোঠারি সাহেব? হাঁপাচ্ছ যে!

—ব্যাপার গুরুতর লেবং!

—গুরুতর?

কোঠারি কহিল—জাহাজে এক অজানা যাত্রী উঠেছে। স্ত্রীলোক!

লেবং হাসিল—আবার টান্‌তে সুরু করেছো নাকি!

দাঁতে দাঁত ঘসিয়া লেবং কহিল—টান্‌তে পারলে ভাল হ'ত…দু'টোকেই তাহলে সাবড়ে দিতে পারতাম…

—দু'টো! লেবং এবার সত্যই কিছু বিস্মিত হইল!

ঘাড় নাড়িয়া কোঠারি কহিল—হ্যাঁ, দুটো। দারুক আর সেই মেয়েটা···বিশ্বাসঘাতক দারুক···আমি তাদের সমস্ত কথা কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছি! মেয়েটা খুব হাসাহাসি করছে। তারা মতলব করেছে, আমাদের দু'জনকে ফাঁকী দিয়ে লুটের টাকা তারা দু'জনে গাপ্ করবে···

—বল কি! লেবং যেন লাফাইয়া উঠিল—আমাদের ফাঁকী দেবে···

কোঠারি কহিল—নিশ্চয় দেবে। মেয়েটার কথা শুনে মনে হ'ল, পূর্ব্বে থেকেই এই মতলব নিয়ে সে কাজ করছিল। আজ একেবারে জাহাজে এসে উঠেছে। সে অনেক কথাই জানে···

—সবুর, সবুর, সবুর। লেবং হাত নাড়িয়া কহিল—তাহলে জাহাজ-আপিসের সেই ঝি-টা বোধ হয়···

—তা জানি না। তবে তাদের মধ্যে রফা হয়েছে, এটা ঠিক! তুমি আর আমি ফাঁকী পড়লাম, লেবং!

কুৎসিত মুখে তাহার পানে চাহিয়া একটা ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত করিয়া লেবং কহিল—ফাঁকী দেওয়া ঘুচিয়ে দেব এখনি! বুড়ো বয়সে দারুক মরেছে একটা মেয়ের কাছে!

কোঠারি জানে লেবং যেমন হিংস্র, তেমনি বেপরোয়া। কহিল—তাহলে এখন কি করবে? ওদের সঙ্গে দেখা করবে?

মাথা নাড়িয়া লেবং কহিল—না। মেয়েটা যখন এত সাহস ক'রে জাহাজে উঠেছে, তখন নিশ্চয় তার পিছনে কোন জোর আছে। সুতরাং আমাদের সাবধানে এগুতে হবে। খুব সাবধানে

…(অস্ফুটে) তোমার সঙ্গে দারুক ডুবুরির পোষাক প'রে সোনা তুল্‌তে সমুদ্রের নীচে নামবে, না ?

—হ্যাঁ, এই রকমই তো স্থির হয়েছে !

—বেশ কথা। নামবে সে। কিন্তু আর ভেসে উঠ্‌বে না ! বুঝেছো আমার কথা !…আমরা এখন এমন ভাব দেখাবো যেন আমরা কিছুই জানি না, কিছুই সন্দেহ করি না ; তারপর জলের নীচে নামলে—ব্যস্‌ ! মেয়েটার ব্যবস্থা তারপর করলেই হবে ! লুটের সোনা ভাগ হবে বটে, কিন্তু দারুক আর তার সঙ্গিনীর মধ্যে নয়, কোঠারি আর লেবংএর মধ্যে।

দুই সয়তান তখন ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া নিজেদের মধ্যে মতলব আঁটিতে লাগিল।

আর কিছু শুনিতে না পাইয়া মোহনলাল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গেল। সে এক সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। মাসুমকে কে হত্যা করিয়াছে তা জানিতে আসিয়া সে জানিয়াছে যে একদল দুর্বৃত্ত সমুদ্রের মোহানার অতল হইতে সোনা তুলিবার জন্য চলিয়াছে এবং বর্ত্তমানে তাহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়াছে। ষ্টীমারে অন্য এক রমণী উঠিয়া তাহাদের প্রত্যেককেই বিচলিত করিয়াছে। কে এই রমণী, এত টাকার স্বর্ণই বা কেমন করিয়া নদীগর্ভে রহিল ? দারুক লোকটা কে ?—এই সকল প্রশ্ন মোহনলালের মাথায় ভীড় করিয়াছে। কিন্তু সে জানিতে পারিল না, ইতিমধ্যে নিয়তি তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত সুরু করিয়াছে এবং তাহার চারিদিকে দারুণ বিপদ ঘনাইয়া উঠিতেছে !

হঠাৎ একটা চীৎকার তাহার কানে আসিল—তিন্নি, তিন্নি খুন...

গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া একজন খালাসী জালিবোটের কাছে গিয়া যন্ত্রণাকাতর মগটাকে দেখিতে পাইয়াছিল! নিমেষ মধ্যে খালাসী মহলে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। জাহাজে অপরিচিত লোক উঠিয়াছে! লেবং হাঁকিল—কি হয়েছে?

একজন বলিল—তিন্নিকে কে আধমরা ক'রে রেখে গেছে! জাহাজে লোক উঠেছে!

চারিদিকে ছোটাছুটি হুড়াহুড়ি আর খোঁজ খোঁজ রব !!

এগারো

মোহনলাল তাহার পিস্তল বাহির করিল। সত্যই আজ সে বিষম বিপদের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়াছে। এতগুলা লোক, আর সে একা! একটা পার্টিশানের গায়ে পিঠ রাখিয়া সে দাঁড়াইল। অদূরে ব্রিজে উঠিবার সিঁড়ি; একপাশে কতকগুলা কাঠের তক্তা জড় করা। ব্রিজের মুখে লেবং আর কোঠারিকে দেখা গেল। একজন খালাসী চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই যে...ওই যে...

তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে! কান-চেপ্‌টা লেবং ক্রূরমুখে তাহার পিস্তল বাহির করিতেছে...ভাবিবার সময় নাই...মোহনলাল অদ্ভুত দক্ষতার সহিত লেবংএর ডানহাত লক্ষ্য

করিয়া গুলি চালাইল। যন্ত্রণার একটা কাতর ধ্বনি···লেবংএর পিস্তল ছিট্‌কাইয়া নদীগর্ভে গিয়া পড়িল।

নীচের তালায় কেবিনের মধ্যে পিস্তলের শব্দ আর গোলমাল পৌঁছিল! দারুক চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সোহিনী কহিল—ও কি! লস্করগুলো নিজেরা নিজেরা লড়াই সুরু করল নাকি!

গোলমাল বাড়িতেছে। দারুক কহিল—আমি দেখছি। তুমি এসো না। অপেক্ষা কর এইখানে।

আবার পিস্তল গর্জ্জিল। ছুরিকা-নিক্ষেপ-উদ্যত একটা খালাসীর উরুতে মোহনলালের পিস্তলের গুলি বিদ্ধ হইল। তারপর মোহনলালের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—যে আমার দিকে আসবার চেষ্টা করবে, তাকেই গুলি করব! হুঁসিয়ার।

দারুকের কানে সে-কথা প্রবেশ করিল। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—এ কি! গোয়েন্দা মোহনলাল! সে যেন বজ্রাহত হইল! বহুবার যাহার সঙ্গে তাহার লড়াই হইয়াছে, এ পৃথিবীতে একটিমাত্র যে মানুষকে সে ভয় করে, সেই মোহনলাল তাহার জাহাজে। দারুক আর অগ্রসর হইল না।

এদিকে মোহনলাল বুঝিল, এ-ভাবে আর বেশীক্ষণ জুঝিতে পারা যাইবে না। পিস্তলের ছ'টা গুলি অচিরেই ফুরাইয়া যাইবে; তখন? তার পূর্ব্বেই তাহাকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে···কোন রকমে জাহাজ হইতে জলে লাফাইয়া পড়িতে পারিলে···

সিঁড়ির ঠিক নীচে আট-দশজন খালাসী লস্কর জড় হইয়াছে।

ব্রিজের উপর লেবং ও কোঠারি। মোহনলাল বুঝিতে পারিতেছে, অনেকের কাপড়ের ভিতর ছুরি উদ্যত; ফাঁক পাইলেই সেই ছুরি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইবে।

কাপড় ছিঁড়িয়া লেবং তাহার হাতে জড়াইয়াছে। মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে—ধর ওকে! সবাই একসঙ্গে ছুটে যাও···যাও, দেরী কোরো না···

কোণ হইতে একটা খালাসী ছুরি উঁচাইতেছে; মোহনলাল হাঁকিল—এই ও; খবরদার! শেষ ক'রে দেব এখুনি। নামাও ছুরি! বোসো ওইখানে!

লোকটা ভয়ে উবু হইয়া ডেকের উপর বসিয়া পড়িল। একটা সুবিধা হইয়াছে যে পিছনদিকটার জন্য ভাবনা নাই! কাঠের পার্টিশানটা তাহার মহা উপকার করিয়াছে। মোহনলালের তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্র দৃষ্টি ক্রমাগত লোকগুলার উপর সঞ্চালিত হইতেছে···মাঝে মাঝে সে হাঁকিতেছে, খবরদার···সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত ছুরিকা নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। তাহার হাতের পিস্তল এদিক হইতে ওদিক হেলিতেছে। লোকগুলা বিমূঢ় নিস্তব্ধ! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, আশ্চর্য্য পরিস্থিতি। একা মোহনলাল···তাহার সম্মুখে হাত-দশেক দূরে অন্তত দশজন হিংস্র রক্তলোলুপ শত্রু জোট বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছে···তাহাদের রক্তবর্ণ চোখে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি, হাতের আঙুলগুলা বাঘের থাবার মত···সুযোগ পাইলেই শিকারের উপর পড়িবে। মোহনলালও সুযোগ খুঁজিতেছে। কোনক্রমে যদি রেলিংএর কাছে যাওয়া যায়···লেবং চীৎকার

করিয়া সঙ্গীদের উত্তেজিত করিতেছে—জোট বেঁধে ছুটে যাও, ধর শালাকে ; যে ওকে আগে ধরতে পারবে, তাকে পাঁচশো টাকা ইনাম দেব।···নিগ্রোটা গুড়ি মারিয়া অগ্রসর হইতেছে ! মোহনলালের নিষেধ সে শুনিতেছে না। পরক্ষণেই হাঁটুতে গুলি লাগিয়া লোকটা ছিট্‌কাইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে অদূরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া একটা খালাসী ব্যাপারটা দেখিতেছিল··· মোহনলাল তাহাকে দেখিতে পায় নাই। লোকটার হাতে ছিল একটা কাঠের লগুড় ! শেষবার মোহনলাল যখন গুলি চালাইবার জন্য পিস্তল উঁচু করিল, সেই সময় অন্ধকার হইতে খালাসীটা লগুড় ছুঁড়িল।···ঘুরিতে ঘুরিতে লগুড়টা মোহন-লালের ডানহাতের কব্জির উপর আসিয়া পড়িল। দারুণ আঘাতে হাত যেন অবশ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা ছিট্‌কাইয়া পড়িল দূরে।

মোহনলালকে অস্ত্রহীন হইতে দেখিয়া লোকগুলা উল্লাসে বীভৎস চীৎকার করিল···দুদ্দাড় শব্দে তাহারা একসঙ্গে তাহাকে আক্রমণ করিল। নিমেষ মাত্র···পরক্ষণেই দেহমনের জড়তা কাটাইয়া মোহনলাল তীরবেগে সম্মুখের দিকে, অর্থাৎ যেদিক হইতে লোকগুলা আসিতেছিল সেইদিকে, ধাবিত হইল। সামনে যে লোকটা পড়িল, অতর্কিত পদাঘাতে সে ধরাশায়ী হইল। মোহনলাল নীচু হইয়া ছুটিল···এদিকে শত্রুদলের মধ্যে নিজেরা নিজেরাই কিছুক্ষণ ধাক্কা-ধাক্কি করিতে লাগিল···পায়ের তলায় নিজেদেরই দলের লোককে মোহনলাল মনে করিয়া তাহারই

পিঠে ছুরি বসাইয়া দিল···একজন আর-একজনকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল। মোহনলাল তখন দূরে চলিয়া গেছে।

কিন্তু সঁকলকার হাত সে এড়াইতে পারিল না। আহত নিগ্রোটা এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল; মোহনলালকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া সে একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। দু'জনেই সশব্দে ডেকের উপর ধরাশায়ী হইল! মোহনলাল তখন মরিয়া। মাথায় আঘাত লাগা সত্ত্বেও সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিগ্রোটাকে উঁচুতে তুলিয়া তাহাকে রেলিং টপ্‌কাইয়া জলে ফেলিবার উপক্রম করিল···

ইতিমধ্যে লেবং মোহনলালের পিস্তলটা কুড়াইয়া লইয়াছিল। দূর হইতে সে নিগ্রোটাকে কি বলিল···নিজের দলের লোকের গায়ে লাগিবে বলিয়া লেবং পিস্তল চালাইতে পারিতেছে না···নিগ্রোটা কি বলিতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে রেলিংএর একটা স্থান ভাঙিয়া সে ও মোহনলাল দু'জনেই সশব্দে জলে পড়িল।

ক্ষণকাল পরে দূরে দূরে মোহনলালের ও নিগ্রোটার মাথা ভাসিয়া উঠিল। জাহাজ তখন থামিয়া গেছে। লেবং মোহনলালের মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইল। যেখানে মোহনলালের মাথা দেখা যাইতেছিল, গুলি ঠিক সেইখানকার জল ভেদ করিল। মোহনলালের মাথা ডুবিয়া গেল আর উঠিল না। নিগ্রোটা সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছিল। দড়ি ফেলিয়া তাহাকে টানিয়া আনা হইল।

লেবংএর পাশে আসিয়া দারুক কহিল—গুলিটা বোধ হয় ফস্‌কায়নি, কি বল ?

গম্ভীরগলায় লেবং বলিল—আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না।

সকলে অনেকক্ষণ অবধি জলের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু মোহনলালকে আর দেখা গেল না। জাহাজ চলিতে লাগিল।

বারো

অদূরে সোহিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লেবং যেন কিছুই জানে না এইভাবে বিস্মিতস্বরে বলিল—কি আশ্চর্য্য! ও কে ?

দারুক কোন উত্তর দিবার আগেই সোহিনী তাহার কাছে আসিয়া কহিল—ব্যাপার কি বলত ? আমি আর কৌতূহল চাপতে পারলাম না।

দারুক এদিক ওদিক চাহিল—কোঠারি কোথায় গেল ? তাকে পেলে সবাই একসঙ্গে ব'সে আলোচনা করা যেতো। লেবং অমন হাঁ ক'রে চেয়ে আছো কেন ! ভূতপ্রেত নয়, মানুষ···

—আমি বুঝতে পারছি না ! ইনি কি আপনার বন্ধু ?··· জাহাজে এলেন কেমন ক'রে ?

—সে সবই বলব। তুমি কোঠারিকে নিয়ে আমার কেবিনে এসো। দারুক সোহিনীকে লইয়া নিজের কেবিনের দিকে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কোঠারি ও লেবং দারুকের কেবিনে পৌছিল ; কিছুই যেন জানে না, এমনি ভাব। দারুক সোহিনীর

পরিচয় দিল। কেন সে আসিয়াছে, তাহাও বলিল। তাহাকে ভাগ দিতে রাজী না হইলে যে অনতিবিলম্বে পুলিশ তাহাদের খোঁজে আসিবে, তাহা শুনিয়া কোঠারি ও লেবং যেন বিষম দমিয়া গেল। অবশেষে তাহারা গজগজ করিতে করিতে কতকটা যেন সোহিনীর কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াই দারুকের কেবিনের বাহিরে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চোখমুখের ভাব বদ্‌লাইল। একটা নিরালা স্থানে আসিয়া চাপা হুঙ্কারের সহিত লেবং বলিল—নীচ বিশ্বাসঘাতক! মেয়েমানুষের হাতে প'ড়ে বেইমানি! ইচ্ছে করছিল, তখনই ভুঁড়ি দি ফাঁসিয়ে,...

—না, না; খুনোখুনি নয় লেবং! কোঠারি কহিল—তাতে সব কাজ পণ্ড হবে। মালটা তো তোলা চাই...

—তা তো চাই। এবং সে মাল দু'ভাগ হবে। একভাগ তোমার, একভাগ আমার।

কিছুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে গোপন পরামর্শ চলিল।

পূর্ণ বেগে জাহাজ ছুটিতেছে। হঠাৎ ঘড়ি দেখিয়া কোঠারি কহিল—আরে! আমরা তো এসে পড়েছি। দূরবীন্, দূরবীন্ দাও। লোকজনদের তৈরী হ'তে বলো।

উভয়েই উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠিল। চোখে দূরবীন্ লাগাইয়াই কোঠারি চীৎকার করিয়া উঠিল—জাহাজের স্পীড কমিয়ে দাও লেবং। আমরা এসে পড়েছি!

দেখিতে দেখিতে জাহাজের ভিতর সাড়া পড়িয়া গেল। খালাসীরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এন্‌জিন্‌ঘরে ক্রমাগত

ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। জাহাজখানা গতি মৃদু করিয়া একস্থানে ধীরে ধীরে ঘুরিতে লাগিল! নদীর মোহানার এই স্থানটা সুদূরবিস্তৃত ; দুই পাশে সীমাহীন কালো জল। তটরেখা চোখে পড়ে না। সম্মুখে গম্ভীর এবং শান্ত সমুদ্রের আভাস!

কোঠারি দারুকের কেবিনের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা খুলিয়া দারুক মুখ বাড়াইল,কোঠারি কহিল—আমরা এসে পড়েছি!

—বল কি! এসে পড়েছি। বলিতে বলিতে দারুক বাহির হইয়া আসিল। সাজ সাজ রব পড়িয়া গেছে। অতলে নামিবার যন্ত্রপাতি গোছানো হইতে লাগিল। বাতাস সরবরাহক যন্ত্রটি রেলিংএর ধারে বসাইতে বসাইতে লেবং দারুককে উদ্দেশ করিয়া বলিল—আপনি ডুবুরির পোষাক পরে নিন। আর দেরী করবেন না।

দারুক একটা জোরালো দূরবীন্ দিয়া অগাধ জলরাশির চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। নাঃ, কোনদিকে কোন জাহাজ, এমন কি ছোট নৌকা পর্য্যন্ত নাই। নির্ব্বিঘ্নেই তাহারা কাজ করিতে পারিবে! সোনা···লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা···চাকৃতির আকারে···কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরা···পড়িয়া আছে পাতাল-পুরীতে। সেই সোনা এখনি উঠিয়া আসিবে তাহাদের হাতে। লেবং ও কোঠারি উভয়ের অন্তরেও একই সুর ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। আয়োজন সমাপ্ত হইলে দারুক ও কোঠারি ডুবুরির পোষাক পরিল। তাহাদের মুখসজ্জার সঙ্গে সংযুক্ত দুইটি রবারের নল বাতাস-সরবরাহ-যন্ত্রের সহিত লাগানো হইল। এই নলের ভিতর

দিয়া বাতাস বহিয়া গিয়া তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসকে সাহায্য করিবে। বড় একটি খাঁচার মতো কাঁচের ঘর। দারুক ও কোঠারি সেই ঘরে ঢুকিল। ধীরে ধীরে সেই ঘরটিকে জলে নামাইয়া দেওয়া হইল। তীক্ষ্ণ তীব্র চোখে লেবং খালাসীদের হুকুম দিতে লাগিল। জাহাজখানা ধীরে ধীরে ঘুরিয়া একস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। নদী শেষ হইয়া সেখানে সমুদ্র সুরু হইয়াছে। যন্ত্র ঘুরিতে লাগিল। দারুক ও কোঠারি আস্তে আস্তে সেই অতল সমুদ্রের নীচে নামিয়া গেল।

তেরো

দারুকের মাথার তামার টুপির উপর একটা শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক সার্চ্চলাইট বসানো ছিল। তাহার আলোয় সমুদ্রগর্ভ উদ্ভাসিত। দারুক অবাক নিস্পন্দ বাক্যহীন। কোঠারির কাছে ইহা নূতন ব্যাপার নয়, তাই সে নীচে নামিয়াই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছে। জঙ্গল বা ধ্বংস-স্তূপ পরিষ্কার করিবার জন্য উভয়ের হাতেই ছোট ছোট ধারালো দু'খানি কুঠার আছে। উত্তেজিতভাবে কুঠার হাতে কোঠারি অগ্রসর হইয়া গেল। তাহার বুকের স্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত। এখনি একটা অঘটন ঘটিবে। ······সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার ছোট যন্ত্রের উপর চোখ বুলাইয়া দারুক দেখিল, তাহারা প্রায় দু'হাজার ফুট নীচে নামিয়াছে··· বড় কম নয়। শোনা গিয়াছিল, নদী ও সমুদ্রের এই সঙ্গমস্থলে

এক এক স্থানের গভীরতা এখনো পর্য্যন্ত মাপিয়া পাওয়া যায় নাই। পায়ের নীচে উঁচুনীচু শ্যাওলাভরা পাহাড়ে-জমি। চারিদিকে বিচিত্র রঙের খেলা। ছোট বড় নানা আকারের মাছ ও সামুদ্রিক জীব তাহাদের পাশ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া দারুক সেই অদেখা অতলের অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিতে লাগিল।

উপরে জাহাজের ডেকে তিন-চারজন লস্কর ক্রমাগত যন্ত্র ঘুরাইতেছে এবং রবারের নল ছাড়িতেছে। ঘুড়ি উড়িলে লাটাই হইতে যেমন সূতা ছাড়া হয়, তেমনিভাবে একটা প্রকাণ্ড কাঠের লাটাই-এ রবারের নল জড়ানো। দারুক ও কোঠারি যেমন আগাইতেছে, তেমনি তেমনি সেই নল খুলিয়া যাইতেছে। নলের শেষ প্রান্ত বাতাস-সরবরাহক যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। অবিরামভাবে পাম্প করিয়া নলের ভিতর দিয়া বাতাস যোগানো হইতেছে।

রেলিংএর পাশ দিয়া নল ছু'টি জলে নামিয়া গেছে। নীচেকার একটা কেবিনের গবাক্ষের পাশ দিয়া একটি নল দেখা যায়। সে-নল দারুকের পোষাকের সঙ্গে সংযুক্ত। ইচ্ছা করিয়াই ওই নলটি ওইভাবে গবাক্ষের পাশ দিয়া গেছে। যে কেবিনের জানলার পাশ দিয়া গেছে, সে-কেবিন লেবংএর! তীক্ষ্ণচোখে চারিদিকে চাহিয়া লইয়া লেবং নীচে নিজের কেবিনে নামিয়া গেল। গবাক্ষের পাশ দিয়া রবারের নলটি নামিয়া গেছে।

সেই দিকে চাহিয়া লেবংএর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। সে-দৃষ্টির মধ্যে সাংঘাতিক হিংসার ছায়া। দারুক তাহাদের ঠকাইতে উদ্যত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের মোহে পড়িয়া দারুক তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সংকল্প করিয়াছে…সুতরাং…

কোমর হইতে একখানা ধারালো ছুরি বাহির করিল লেবং …নরম রবারের নল…ঠেকিতে না ঠেকিতেই কাটিয়া দু'খানা হইয়া যাইবে। বাতাস অভাবে অতলের নীচে দারুক হাঁপাইয়া মরিবে। সেই তার উপযুক্ত পুরস্কার! বিশ্বাসঘাতকের পুরস্কার! কেবিনে কোন আলো ছিল না। বাহিরের স্তিমিত আলোর আভাসমাত্র আসিতেছে সঙ্কীর্ণ রেখায়। লেবংএর হাতের বাঁকা ধারালো ছুরি রবারের নল স্পর্শ করিল। হাত বাড়াইয়া লেবং নলটাকে টানিয়া ভিতরে আনিয়াছে।

উত্তেজিত লেবং জানিতে পারিল না যে ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তাহার কেবিনের ভিতর আসিয়াছে এবং সেব্যক্তি রমণী! হাতের পিস্তল উদ্যত করিয়া তরুণী লেবংএর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত লেবংএর উপর সে ঝাঁপাইয়া পড়িল! লেবং ফিরিয়া দাঁড়াইবার আগেই সোহিনীর হাতের পিস্তলের অগ্রভাগ সজোরে তাহার কপালের উপর লাগিল। একবার, দু'বার, তিনবার! লেবং চেতনা হারাইয়া মেঝেয় পড়িল।

কয়েক সেকেণ্ড স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সোহিনী বোধ করি দম লইল। তারপর বাঁ পা দিয়া লেবংএর দেহটা একপাশে

সরাইয়া দিয়া আপন মনে কহিল—তুমি যে এই রকম একটা মতলবের পিছনে ছিলে তা আমি তোমার চোখ দেখেই টের পেয়েছিলাম। থাকো এখন কিছুক্ষণ এইখানে।

* * * *

সমুদ্রগর্ভে অন্বেষণরত জীহন দারুক এ-সবের কিছুই জানিতে পারিল না। মাথায় বাঁধা সার্চ্চলাইটের আলোয় সে তখন কোঠারির সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড গুহার মধ্যে নামিয়াছে। জলের তলায় এই গুহা লম্বাচওড়ায় যে কত বড়, তার হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। পনেরো বছর আগে স্বর্ণবাহী জাহাজ এইখানে ডুবিয়া সেই গুহার ভিতর তলাইয়া গিয়াছিল। কিছুদূর যাইবার পর কোঠারি হাত নাড়িল। সম্মুখে সামুদ্রিক গাছপালায় গা ঢাকিয়া যেন একটা বিরাট দৈত্য শুইয়া আছে। জীহন তাহার উপর একস্থানে কুড়ুলের ঘা মারিল। ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল। কাঠের শব্দ। ক্রমে জাহাজের অন্য অংশ দেখা গেল। উত্তেজনায় জীহন অস্থির হইয়া উঠিল। স্বর্ণবাহী জাহাজের সন্ধান তাহারা পাইয়াছে। ...উভয়ে একটা ভাঙা জায়গা দিয়া খোলের মধ্যে নামিল। জাহাজখানা বাঁ-দিকে হেলিয়া আছে। গুড়ি মারিয়া তাহারা চারিদিক সন্ধান করিতে লাগিল।...কোঠারি মাঝে মাঝেই দারুকের মুখের পানে তাকাইতেছে। সে যেন কিছু একটা ঘটিবার অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না। সে আশা

করিতেছে, এইবার হঠাৎ জীহন বাতাস অভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিবে, মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিবে। কিন্তু কৈ, কিছুই তো হইতেছে না! জীহন কোঠারিকে লইয়া উপর ডেক হইতে নীচেকার ডেকে নামিল। মালপত্র রাখিবার কেবিন থাকে এক পাশে। উভয়ে সেইদিকে অগ্রসর হইল! কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হইল। দুইটা বড় বড় কাঠের সিন্দুক···দারুকের কুঠারের আঘাতে জীর্ণ সিন্দুকের ডালা খুলিয়া গেল। ভিতরে হাত ঢুকাইতেই হাতে লাগিল, গোলাকার ধাতুর চাক্‌তি। দারুকের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। গিনি, হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা!

পরমুহূর্ত্তেই দু'হাত ভরিয়া জীহন গিনি উঠাইল। উভয়ের টর্চ্চের আলো পড়িল, সেই মুদ্রাগুলির উপর। সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মুখ দিয়াই অস্ফুট বিস্ময়োক্তি নির্গত হইল।

উপরে লস্করগণ পাম্প চালাইয়া চলিয়াছে। হেড্‌ লস্কর কাণে টেলিফোনের চোঙা লাগাইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে সঙ্কেতের অপেক্ষা করিতেছে। বড় একটা বিদ্যুতিক যন্ত্রে ঘর্ঘর শব্দে কাজ চলিতেছে···

সেখানে দাঁড়াইয়া আছে সোহিনী। সকলের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কাজ ঠিকমত হইতেছে কি না, তাহা সে তদারক করিতেছে। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তথাপি ডুবুরি দু'জনের নিকট হইতে কোন সঙ্কেত আসিল না। সোহিনী অসহিষ্ণু হইয়া হেড্‌ লস্করকে কহিল—নীচেকার কোন খবর নেই?

সে ঘাড় নাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতিক যন্ত্রের লাল আলো দু'তিনবার নিবিল, জ্বলিল। সঙ্কেত আসিয়াছে। হেড্ লস্কর তীব্রকণ্ঠে আদেশ দিতে লাগিল। ঘড় ঘড় শব্দে খালাসীরা দড়ি গুটাইতে লাগিল। কপালের ঘাম মুছিয়া সোহিনী একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দারুক আর কোঠারি জাহাজে উঠিয়া আসিল। উভয়কেই অতিশয় বিচলিত দেখাইতেছিল। সোহিনীর মুখ প্রদীপ্ত হইল। দারুকের হাতে একটা ছোট চামড়ার থলি। তাহার ভিতরে স্বর্ণ-চাকৃতির আভাস পাওয়া যাইতেছে। কতকগুলা নমুনা লইয়া তাহারা উঠিয়া আসিয়াছে। সমগ্র সিন্দুক উঠাইয়া আনিতে পারে নাই······

—লেবং কোথায়? লেবং? জীহন দারুক প্রশ্ন করিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সোহিনী কহিল—তার কেবিনে আছে। কিন্তু লেবং পরে। আগে আমি দেখতে চাই গিনিগুলো···

—গিনি দেখবে? বিচিত্রস্বরে দারুক কহিল—সোনা চাও? আচ্ছা, দেখ তাহলে। বলিয়া একটা ছোট টেবিলের উপর দারুক তাহার চামড়ার থলিটা উপুড় করিয়া দিল।

খন্ খন্ শব্দে ভিতরকার চাকৃতিগুলা টেবিলের উপর পড়িল। সোহিনী অবাক হইয়া গেল। এ কী! এগুলো তো গিনি নয়! এ যে সিসার চাকৃতি! সিসা। অপদার্থ মূল্যহীন সিসা!

দাঁতে দাঁত ঘসিয়া দারুক কহিল—হ্যাঁ সোহিনী, সিসে, সোনার বদলে সিসে। গিনির বদলে সিসের চাকৃতি ছু'সিন্দুকে ভরা! প্রকাণ্ড জোচ্চুরি! পনেরো বছর আগে যে এই কারবার করেছিল, অর্থাৎ গিনি রপ্তানি যার দ্বারায় হয়েছিল, সে দশলক্ষ টাকার জোচ্চুরিতে ছিল লিপ্ত। গিনির বদলে সিসে ভ'রে সে মাল পাঠিয়েছিল। জাহাজ ডুবিটাও বোধ হয় তারই কারসাজি! কিন্তু লেবং কোথায়? তাকে এ সুখবরটা যে না দিলেই নয়! আহা! অনেক আশা ক'রে সে আমাদের জাহাজ জুগিয়েছিল!

দারুক অগ্রসর হইয়া গেল। সোহিনী তাহার পিছনে। লেবংএর কেবিনে ঢুকিয়া দারুক আলো জ্বালিয়া দিল! এ কী ব্যাপার! কেবিনের এক কোণে হাত-পা-মুখবাঁধা লেবং কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে!

চৌদ্দ

নিগ্রোটা জাহাজে উঠিবার পর জাহাজ আবার পূর্ণবেগে অগ্রসর হইল! ডুব-সাঁতার কাটিতে কাটিতে মোহনলাল বহু দূরে গিয়া উঠিল। অতি অল্পের জন্যই সে সে-যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছিল। প্রবল জোয়ারের টানে সে উত্তর দিকে চলিয়া যাইতেছে। কিনারা বেশী দূর নয়! কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যবধানটুকু পার হইয়া সে ডাঙায় উঠিল। পথের উপর একটি

পানবিড়ির দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল, জোয়ারের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সে লালপুরের পাশের গ্রামে আসিয়া উঠিয়াছে। ফাঁড়ী? হ্যাঁ, ফাঁড়ী আছে কাছেই—বড় ফাঁড়ী। একটি লোক তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। ফাঁড়ীতে আসিয়া সম্মুখের ঘরে উপবিষ্ট দারোগার কাছে সে যখন আত্মপরিচয় দিল, তখন তাহার চেহারা দেখিয়া দারোগা তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। তাহাকে নেশাখোর মনে করিয়া কটূক্তি সহকারে ভাগাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

এমন সময় ভিতর হইতে দারোগার ডাক আসিল। দারোগা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—যাও, যাও, এখন স'রে পড়। তুমি হ'লে গিয়ে কলকাতার বিখ্যাত গোয়েন্দা মোহনলাল! তাহলে আমি হলুম, কমাণ্ডার-ইন-চীফ ওয়েভেল! পাগলামীর আর জায়গা পাওনি? এখন আমরা ব্যস্ত আছি। কলকাতা থেকে বড় ইনস্‌পেক্টার কবীর এসেছে। বড়বাবুর সঙ্গে পরামর্শ চলছে! কাল বরং এসো, রং-তামাসা করা যাবে।

কবীর আসিয়াছে! তাহার পুরাতন বন্ধু এবং সুদক্ষ পুলিশ অফিসার কবীর! মোহনলাল আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদে দারোগার পাশ কাটাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া যে-ঘরে কবীর ও স্থানীয় ইনস্‌পেক্টার বসিয়া পরামর্শ করিতেছিল, ঝড়ের মত সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়···কয়েক মুহূর্ত্তের নিস্পন্দ নীরবতা···তারপর বিস্ময়োক্তি···আনন্দ জ্ঞাপন···পরিচয়ের আদান-প্রদান···আবার

বিস্ময়···স্থানীয় ইনস্‌পেক্টার ও দারোগার সম্মান জ্ঞাপন··· মোহনলালের ভিজা কাপড়জামা পরিবর্ত্তন।

শুক্‌নো কাপড় পরিয়া এক কাপ গরম চা খাইয়া একটা তৃপ্তিসূচক শব্দ করিতেই তিনদিক হইতে প্রশ্ন আসিতে লাগিল। মোহনলাল কহিল—সে এক মস্ত গল্প। বলব পরে। তার আগে ইনস্‌পেক্টার কবীরের কাছে জানতে চাই, এ অঞ্চলে আসবার কারণ কি!

কবীর কহিল—এখান থেকে সংবাদ গেছে যে লালপুর অঞ্চলে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর এক লস্কর খুন হয়েছে। লস্করটি কিছুদিন থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। এই বলিয়া সে ললিতের প্রচারিত কাহিনী ও জনরব যাহা শুনিয়াছিল, তাহা বিবৃত করিল।

ধীরে ধীরে মোহনলাল কহিল—জনরব মিথ্যা নয়, কবীর। সে লস্কর সত্যিই খুন হয়েছে এবং তার মৃতদেহ কোথায় আছে তাও আমি জানি।

অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে কবীর নির্ব্বাক! ইনস্‌পেক্টার কহিল—কি আশ্চর্য্য! আপনি জানেন! আমরা কত খোঁজ করলাম···

তারপর সেই ছোট্ট পুলিশ ষ্টেশনে মহা চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। একখানা ভাঙা ফোর্ড্‌ মোটর সংগ্রহ করা হইল। তাহাতে চাপিয়া মোহনলাল, কবীর, ইনস্‌পেক্টার ও দারোগা লালপুর অভিমুখে ছুটিল। গাড়ীতে বসিয়া মোহনলাল তাহার লালপুরে আগমনের কারণ বিবৃত করিল।

গোরস্থানের দিকে যাইবার আগে মোহনলালের নির্দ্দেশে তাহাদের মোটর থাকো-বাড়ীওয়ালীর হোটেলের সম্মুখে আসিয়া থামিল। সতু বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিল। মোহন-লালের আহ্বানে হর্ষোদ্বেলিতকণ্ঠে সাড়া দিয়া নিকটে আসিল। মোহনলাল তাহাকে মোটরে তুলিয়া লইল। অন্যান্য কথার পর সতু কহিল—মাসুম এ অঞ্চলে কেন এসেছিল তার কারণ জানা গেছে। তার এক বুড়ী পিসি এই গ্রামে থাকে, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে এসেছিল।

মোহনলাল কহিল—মূল্যবান খবর। এইখানে এসে কোঠারি আর লেবংএর সঙ্গে তার দেখা হয়। সমুদ্রের তলা থেকে সোনা তোলা সম্বন্ধে সে বোধ হয় অনেক কথাই জানতো তাই এরা তার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা গোরস্থানে পৌঁছিল এবং কবরের ভিতর মাসুমের মৃতদেহটি ইনস্‌পেক্টার কবীর অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিল। নিহত ব্যক্তি যে মাসুম তাহাতে সংশয় রহিল না। মিনিট পাঁচেক পরে ইনস্‌পেক্টার কবীর নিজের খাতায় কয়েকটা নোট লিখিয়া লইয়া মোহনলালকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—কিন্তু এর দ্বারা এমন তো কোন প্রমাণই পেলাম না, যার জোরে দারুক বা তার দলকে গ্রেপ্তার করি। কে খুন করেছে তা যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ…

মোহনলাল কহিল—আশা করা যায়, শিগ্‌গিরই সে প্রমাণ তোমায় দিতে পারবো।

সতু কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। সে হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল—ওরা ফিরে আসছে…

—ফিরে আসছে?

—হাঁ, ঐ দেখুন। জাহাজখানা ধীরে ধীরে আসছে। সামনে জোড়া লাল আলো, ওদেরই জাহাজ!

সত্যই, সদলবলে দারুক জাহাজ লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে! এত সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের কাজ কি শেষ হইল, অথবা কোন গোলমাল হইয়াছে?

পনেরো

পায়ের কাছে ঐ অবস্থায় লেবংকে দেখিয়া দারুক বিস্ময়ের আতিশয্যে কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। দুর্দ্ধর্ষ, সুচতুর, কৌশলী লেবং—তাহার এ লাঞ্ছনা কে করিল?

—লেবং, লেবং! কে এ কাজ করলে?

পাশ থেকে সোহিনী বলিল—অনিষ্ট করবার আগে আমিই ওকে আটকেছি।

—তুমি…

ঘাড় নাড়িয়া সোহিনী কহিল—তোমার বাতাস-সরবরাহের নলটা এই ভদ্রলোক কেটে দেবার মতলব করেছিল, আর একটু হলেই কেটে দিত, এমন সময় আমি এসে মাথায় পিস্তল দিয়ে মেরে একে কাবু ক'রে ফেলি, তারপর হাত-পা বাঁধা শক্ত হয়নি।

বিড়বিড় করিয়া দারুক কহিল—আমার বাতাস-নল কেটে দিচ্ছিল, অর্থাৎ আমায় মারবার যোগাড় করছিল...বুঝেছি... আমরা যে ওর ভাগের টাকা ওকে না দেবার মতলব করেছিলাম, তা বোধ হয় ও জানতে পারে, তাই। বলিতে বলিতে হঠাৎ দারুক হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং নীচু হইয়া লেবংএর বাঁধন খুলিয়া দিল। লেবং উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দারুক কহিল—বন্ধু লেবং, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলে যে তোমায় আমরা ফাঁকী দেব? বোকা! তা কখনো হয়! 'এস্ এস্ অজন্তা' থেকে আমি ধনরত্ন তুলে এনেছি। দেখবে চল। যা এনেছি, তার সমস্ত তোমাকে দেব।

লেবং তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারার কথাও নয়। সে নিঃশব্দে দারুকের সঙ্গ লইল। অদূরে কোঠারি দাঁড়াইয়া। তাহার চোখমুখের ভাব বর্ণনাতীত; পরিশ্রান্ত এবং নিরাশাকাতর দুই চোখের ব্যঞ্জনায় নিষ্ফল ক্রোধের আভাস। উচ্চকণ্ঠে দারুক বলিল—কোঠারি! লেবং আমার কথায় বিশ্বাস করছে না। আমি তাকে বলছি, সমুদ্রের নীচেকার যে মাল আমরা পেয়েছি, সে সমস্তই আমরা লেবংকে দিয়ে দিচ্ছি; অবশ্য আমি জানি না, বাজারে এখন সিসের দর কত...

—সিসে! লেবং বলিয়া উঠিল—সিসে কি বলছেন?

—ঠিকই বলছি বন্ধু! খাঁটি সিসের চাকতি পেয়েছি হাজার হাজার! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ক্রূর হিংস্র দৃষ্টিতে দারুকের পানে চাহিয়া লেবং বলিল—বিশ্বাস করি না। আমায় ফাঁকী দেবার মতলব!

মাথা নাড়িয়া কোঠারি কহিল—না, লেবং! সত্যি কথা! পনেরো বছর আগে যখন 'অজন্তা' ডুবি হয়, তখনই কেউ কারসাজী ক'রে বহু টাকা গাপ্ করেছে; সোনার বদলে সিসের চাকৃতি ভ'রে কাঠের বাক্সগুলো জাহাজে বোঝাই করেছিল।

সত্যিই সিসার চাকৃতি। সেগুলা দেখিয়া লেবংএর মুখে আর কোন কথা রহিল না। কিছুক্ষণ পরে শান্তদৃঢ়কণ্ঠে দারুক বলিল—আমরা ভয়ানক ঠকেছি। অনেক পয়সা নষ্ট হল। কিন্তু হতাশ হ'লে চলবে না। দেখতে হবে শেষ পর্য্যন্ত। নীচে নেমে জাহাজখানা তল্লাস করতে করতে আমরা প্রমাণ পেয়েছি, জাহাজ এমনি ডোবেনি; ইচ্ছে ক'রে ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে ডোবানো হয়েছে…

—ইচ্ছে ক'রে ডোবানো হয়েছে! লেবং কহিল—তার মানে, যারা সোনার বদলে সিসে তুলেছিল জাহাজে, তারাই জাহাজখানা ডুবিয়েছে।—যাতে ক'রে, তারা যা করেছে, তা কেউ জানবে না…মানে…

—মানে, সমস্ত সোনা তারা গাপ করেছে। তার বদলে দিয়েছে সিসে! জাহাজ না ডুবলে ধরা পড়ত। কিন্তু জাহাজ ডুবল, তারা গেল বেঁচে! পনেরো বছর পরে এ রহস্য আমরা উদ্‌ঘাটিত করেছি। সুতরাং এর দাম চাই।

দারুকের কথায় তিনজনে তার মুখের পানে চাহিল। দারুক

কহিল—এই কাজের পিছনে প্রকাণ্ড একটা ষড়যন্ত্র ছিল। জাহাজখানার নীচেকার একটা কেবিনে মস্ত একটা গহ্বর দেখেছি; আমার ধারণা, বোমা দিয়ে জাহাজের তলা ছেঁদা ক'রে দেওয়া হয়। 'অজন্তা' ডোবার বিবরণ আমার মনে আছে। অনেকগুলো খালাসী-লস্কর মারা যায়।

কোঠারি বলিল—কিন্তু পনেরো বছর বাদে আমরা এখন আর কি করতে পারি? যারা এ-কাজ করেছিল, তারা হয়ত বেঁচে নেই।

ঘাড় নাড়িয়া দারুক কহিল—আছে। অন্তত একজন আছে। এই সোনা কেনা-বেচা যে করত, সম্ভবত, যে এই মাল রেঙ্গুনে পাঠাবার আয়োজন করেছিল, সে আজো বেঁচে আছে!

—কে সে? তার পরিচয় কি?

দারুক কহিল—হাওড়ার প্রকাণ্ড ধনী ব্যবসায়ী রায় সাহেব যুগলদাস মেহেতা এই ব্যবসা করত, আমি জানি। মাসে মাসে বহু লক্ষ টাকার সোনা সে রেঙ্গুন পাঠাতো। রেঙ্গুনে থাকবার সময় এ-খবর আমি পেয়েছিলাম। দারুকের মুখচোখ প্রদীপ্ত হইল—অসম্ভব ধনী এই যুগলদাস মেহেতা। সুতরাং আজ আমরা নিরাশ হ'য়ে যে ক্ষতি পেলাম, তা সে পূরণ করবে।

লেবং ও কোঠারি তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সোহিনী ঘাড় নাড়িয়া উদ্দীপ্তমুখে বলিল—একটা কাজ করা যায়। তোমাদের এই জাহাজ-কোম্পানীটা তো তাকে বিক্রী ক'রে দিতে পার।

তাহার কথা শুনিয়া দারুক বলিয়া উঠিল—সাবাস সোহিনী! একটা বুদ্ধি দিলে বটে। ঠিক। এই ব্যবসা আমরা যুগলদাসের কাছে বেচে ফেলব। এর দাম ধার্য্য করা যাক। ধর, দু' লক্ষ টাকা।

লেবং হাসিল ; কহিল—ব্যবসার মধ্যে তো এই জাহাজখানা, বিক্রি করতে গেলে পাঁচশো টাকা দামও উঠ্‌বে না। ব্যবসা তো ঢুঁ ঢুঁ! দু' লক্ষ টাকা দেবে কে?

সজোরে দারুক বলিল—অন্য কেউ দেবে না, কিন্তু রায় সাহেব যুগলদাস দেবে ; দিতেই হবে তাকে। যদি সোনার বদলে সিসে ভরার কাজটা তার দ্বারায় হোয়ে থাকে, তাহলে সে চাইবে না যে সত্যি কথা প্রকাশিত হোক ; অর্থাৎ আমরা যে জাহাজ-কোম্পানীর ব্যবসা ক'রে সেই ডোবা-সোনা উদ্ধারের কাজে লাগবো, তা সে কোনমতেই চাইবে না—কারণ তাতে ক'রে সোনা যে সিসে, তা জানাজানি হ'য়ে পড়বে ; সুতরাং সহজেই তার কাছ থেকে এই কোম্পানীর মূল্য হিসাবে দু'লক্ষ টাকা আদায় করা যাবে। অতএব জাহাজ ঘোরাও লেবং! হতাশ হোয়ো না। জলের তলায় পেয়েছি সিসে। তারই জোরে হাতের মুঠোর মধ্যে পেলাম দু'লক্ষ টাকা! এর মধ্যে আর ভুলচুকের সম্ভাবনা নেই।

ষোলো

ইতিমধ্যে ইনস্‌পেক্টার কবীর ও ইনস্‌পেক্টার রসিদ কাছাকাছি থানা হইতে অনেকগুলি দারোগা ও কনষ্টেবল আনাইয়া লালপুরের চতুর্দ্দিকে নিযুক্ত করিয়াছে। জাহাজ-কোম্পানীর প্রত্যেক কর্ম্মচারীর প্রতি নজর রাখিবার জন্য তাহাদের প্রতি বিশেষ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। চারিদিকে একটা চাপা সন্ত্রস্ত সচকিত ভাব!

অন্য সকলে কাদেরের হোটেলে অপেক্ষা করিতেছে। মোহনলাল জাহাজ-আপিসের ধারে অন্ধকার স্থানে দাঁড়াইয়া কি যেন দেখিতেছে। দারুক, লেবং, কোঠারি এবং সেই রমণী। তাহারা যদি এক্ষণে একত্রে মিলিত হয়, তাহা হইলে হয়ত অনেক কথাই আলোচনা করিবে! কিন্তু কই, তাহারা তো জাহাজ হইতে নামিতেছে না। যাই হোক, ধৈর্য্য ধরিয়া আপক্ষা করিতেই হইবে। নিঃশব্দে মোহনলাল জাহাজ-আপিসের ভিতরে ঢুকিল। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চ্চ জ্বালিতে সাহস হয় না। বাহির হইতে যদি কেহ দেখিয়া ফেলে তো সন্দেহ করিবে। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে মোহনলাল একটা ঘর পার হইয়া বড় একটা কাঠের দেরাজের পাশে দাঁড়াইল। সাম্‌নে জানলা। জানলার ফাঁক দিয়া জাহাজঘাট দেখা যাইতেছে। কে যেন কি হুকুম দিতেছে!…

অনেকগুলা লোক জাহাজ হইতে নামিল।…আপিসের বাহিরে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তোমরা এসো আমার সঙ্গে।

জাহাজ-আপিসের দরজা খুলিয়া এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। পিছনে জ্বলন্ত হারিকেন হাতে অপর একটি লোক। হারিকেনটা সম্মুখস্থ টেবিলে রাখা হইল। দেরাজের পিছন হইতে উঁকি দিয়া মোহনলাল বুঝিল, প্রথম ব্যক্তি দলের কর্ত্তা, জীহন দারুক! দারুকের আহ্বানে অনেকগুলি লস্কর ভিতরে আসিল। মোহন-লাল উৎকর্ণ হইল। দারুকের কণ্ঠস্বর তাহার স্মৃতির দরজায় ধাক্কা দিতেছে! কোথায় যেন সে এই স্বর পূর্ব্বে শুনিয়াছে! দারুকের আহ্বানে কয়েকজন লস্কর এবং খালাসী সামনে আসিল। পকেট হইতে একটা বড় চামড়ার নোটকেশ বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে দারুক একতাড়া নোট লইয়া একখানা একখানা করিয়া লস্কর খালাসীদের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিল। সকলকে টাকা দিয়া দারুক কহিল—তোমাদের যা মাইনে তার চেয়ে বেশীই আমি তোমাদের দিলাম। আমি তো বলেই দিয়েছিলাম যে, বেশীদিন আমার কাজ হবে না! যাই হোক, তোমাদের খুসী করবার জন্যে ডবল মাইনে দিয়ে দিলাম।

হেড্ লস্কর সেলাম করিয়া কহিল—হুজুর, আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে আবার যদি কখনো দরকার হয়, তখন যেন খবর পাই।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! খবর দেব বৈকি! আচ্ছা, এসো তোমরা!

তাহারা একে একে বাহির হইয়া গেল। মোহনলাল বুঝিল, মাহিনা চুকাইয়া দিয়া ইহাদের বিদায় দেওয়া হইল। অর্থাৎ আর জাহাজ চলিবে না ; জাহাজের কাজ শেষ হইয়াছে! দেরাজের পাশ হইতে উঁকি দিয়া মোহনলাল দারুকের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সক্ষম হইল না। হঠাৎ দারুক হারিকেন লণ্ঠনটার কাছে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে কতকগুলা গোলাকার চাক্‌তি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল! কালো কালো চাক্‌তি, সিসার চাক্‌তি···বিস্ময়ে মোহনলালের মাথাটা দপ্‌ করিয়া উঠিল···গিনির বদলে ইহারা কি সমুদ্রের তলা হইতে সিসা পাইয়াছে ? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তো ব্যাপার যেমন বিচিত্র, তেমনি গূঢ়রহস্যপূর্ণ!

সশব্দে দরজা খুলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিল কান-চেপ্‌টা লেবং। তাহার চোখমুখের ভাব অত্যন্ত ভীতত্রস্ত ; কম্পিতকণ্ঠে কহিল—ওরা তাকে দেখতে পেয়েছে···

তীক্ষ্ণকণ্ঠে দারুক বলিল—হয়েছে কি! অ্যাঁ! কে কাকে দেখতে পেয়েছে ?

ভাঙা গলায় লেবং কহিল—সেই মরা লস্করটাকে। সন্ধান পেয়ে অনেক পুলিশ এসে পড়েছে।

দারুক অগ্রসর হইয়া লেবংএর কাঁধ চাপিয়া ধরিয়া ধমক দিয়া কহিল—ঠিক ক'রে বল, কি হয়েছে! পুলিশ এসেছে, তার মানে কি ? দেখতে পেলেই বা কেমন ক'রে ?

—তা জানি না! সরাইখানায় যেতে গিয়ে দেখলাম।

দেখলাম, মাসুমের দেহটা নিয়ে তারা একটা মোটরে তুলছে। আমাদের স'রে পড়তে হবে; তা না হ'লে…

—মোহনলাল!

—অ্যাঁ! সেই গোয়েন্দা…

দারুক বলিল—হ্যাঁ, এ তারই কাজ। সে বেঁচে আছে। কিন্তু এখন পালানো চলবে না। পালাতে গেলে সন্দেহ বাড়বে। নিহত লস্করকে পেয়েছে, তাতে আমাদের কি? আমরা যে-কাজ হাতে নিয়েছি, সে কাজ শেষ না ক'রে ফিরবো না।

লেবং কি বলিতে গেল, কিন্তু দারুক তাহার কোন কথাই শুনিল না। পাঁচলক্ষ টাকা হস্তগত না করিয়া দারুক কোথাও নড়িবে না। আজ রাত্রে কাদেরের হোটেলে পরামর্শ-সভা বসিবে, সেখানে লেবং যেন হাজির থাকে। লেবং আর কোন কথা না বলিয়া প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে দারুকও বাহির হইয়া পুনরায় জাহাজে উঠিল। ইত্যবসরে মোহনলাল জাহাজ-আপিস হইতে বাহির হইয়া আসিল। পাঁচলক্ষ টাকা! এত টাকা দারুক লোকটা কোথা হইতে কেমন করিয়া সংগ্রহ করিবে? শিকারী গ্রেহাউণ্ডের মত মোহনলাল কৌতূহলে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

পিছনে অস্ফুট পদশব্দ! মোহনলাল কান খাড়া করিল। পরমুহূর্ত্তে তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। কবীরের নিয়োজিত চর ভুলক্রমে তাহাকে অনুসরণ করিতেছে! কয়েক সেকেণ্ড নিশ্চল থাকিয়া মোহনলাল সাঁ করিয়া একটা গাছের তলায়

ছায়ার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লোকটি বলিল—মাপ করবেন মিঃ মিত্র! আপনাকে প্রথমটা চিন্‌তে পারিনি!

মোহনলাল্ তাহাকে জাহাজ-ঘাটের কাছাকাছি থাকিতে বলিয়া খানিকটা পথ ঘুরিয়া কাদেরের হোটেলে আসিয়া পৌছিল। খবর লইয়া জানিল, দারুক ও লেবং ইতিপূর্ব্বেই আসিয়াছে। এইবার কোঠারি আসিলেই দল সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু কোঠারি আসিল না।

সতেরো

থাকো-বাড়ীওয়ালীর হোটেলে সতু ও ইনস্‌পেক্টার রসিদ নীচে বসিয়াছিল। উপরের ঘরে থাকে কোঠারি। তাহাকে নজরছাড়া করা হইবে না। আধ ঘণ্টা···একটা ঘণ্টা হইয়া গেল···রাত-আর বেশী বাকি নাই। ক্রমে পূবের আকাশে হলদে আভা দেখা দিল।···এমন সময় দেখা গেল, কোঠারি নীচে নামিতেছে। সতু ও রসিদ সজাগ হইয়া বসিল। কোঠারি হোটেল হইতে বাহির হইল। সতু ও রসিদ কিছুদূরে তাহার পিছনে। কোঠারি তাহাদের দেখিতে পাইল না।

সারা রাত্রি ভূতের তাড়া খাইলে মানুষের যে অবস্থা হইতে পারে, কোঠারির অবস্থাও তদ্রূপ! চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, চুলগুলা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে; সারা রাত সে ঘুমায়

নাই—যে কোন কারণেই হোক সে ভয়ানক ভয় পাইয়াছে! কোঠারি ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছে। সতু ও দারোগা তাহাকে অনুসরণ করিল।

*　　*　　*　　*

স্থানীয় টেলিগ্রাফ আফিস হইতে কলিকাতার সদর থানায় টেলিফোন করিয়া কয়েকটা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়া মোহন-লাল সরাইখানায় ফিরিয়াছে, এমন সময় 'তার'-আফিস হইতে সাইকেল চালাইয়া একব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া একখানা কাগজ দিল। কবীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মোহনলাল কহিল—হাওড়া থেকে সতু ফোন্ করেছে।

—হাওড়া থেকে?

ঘাড় নাড়িয়া মোহনলাল কহিল—হ্যাঁ। কোঠারি এখান থেকে স'রে পড়েছে। সতু জানাচ্ছে যে সে তাকে অনুসরণ ক'রে হাওড়ায় গেছে এবং কোঠারি একটা চায়ের দোকানে ব'সে আছে! আমাদের যেতে হবে এখুনি।

কবীর কহিল—এখানকার ব্যবস্থা?

মোহনলাল উত্তর দিল—এখানে ওদের দু'জনের ওপর তোমার লোক নজর রাখবে। তাছাড়া উপস্থিত কিছু করবার নেই। পনেরো বছর আগেকার জাহাজডুবি সম্বন্ধে আমি এইমাত্র হের্ড কোয়ার্টার থেকে যে খবর পেলাম, তার সঙ্গে

কোঠারির হাওড়ায় যাওয়ার যোগাযোগ যদি থাকে, তাহলে তুমি দেখবে কবীর, এই রহস্যের পিছনে বিস্ময়কর ঘটনাচক্র লুকিয়ে আছে। কোঠারির গতিবিধি এখন আমাদের বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করতে হবে।

দারোগাকে যথাবিহিত নির্দ্দেশাদি দিয়া উভয়ে ষ্টেশনে আসিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওড়ায় পৌঁছিয়া সতুর নির্দ্দেশিত স্থানে পৌঁছিয়া তাহার সহিত সাক্ষাত করিল। ষ্টেশন হইতে প্রায় আধমাইল উত্তরে এক নির্জ্জন পল্লীর প্রান্তে একটা মুদির দোকানের সামনে সতু বসিয়াছিল। মোহনলালের প্রশ্নের উত্তরে বলিল—এই গলির মধ্যে রায় সাহেব যুগলদাস মেহেতার বাড়ী। কোঠারি সেই বাড়ীতে গিয়ে ঢুকেছে। রসিদ দারোগা বাড়ীর কাছে আছে; আমি মোড়ের মাথায় আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

রায় সাহেব যুগলদাস মেহেতা! কোঠারি তাহার বাড়ীতে গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে! উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য স্পষ্ট। মোহনলালের দুইচক্ষু উজ্জ্বল হইল! পনেরো বছর আগে দশলক্ষ টাকার গিনির সহিত যে জাহাজ রহস্যময়-ভাবে ডুবিয়াছিল, সে-জাহাজে মাল রপ্তানির কর্ত্তা ছিল এই রায় সাহেব যুগলদাস! প্রকৃতপক্ষে যুগলদাসই সেই মাল রপ্তানি করিয়াছিল এবং তাহার নিজস্ব ব্যাঙ্ক্ হইতে মাল জাহাজে উঠিয়াছিল। এতদিন পরে এক ডাকাতের দল সমুদ্রের তলায় সেই জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাইয়া সোনা তুলিবার

জন্য সমুদ্রের নীচে নামিয়া সোনার বদলে সিসা পাইয়াছে! এই ঘটনার পরেই কোঠারি আসিয়াছে যুগলদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। শুধু সাক্ষাৎ করিতে না, রফা করিতেও।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কোঠারি বাহির হইয়া আসিল। সে পুলিশের দলকে দেখিতে পাইল না। কিছুদূর গিয়া একটা দেশী মদের দোকানে ঢুকিল। সতু রায় সাহেবের বাড়ীর কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। মোহনলাল, দারোগা ও কবীর সেই গলির মোড়ে। কিছুক্ষণ পরে কোঠারিকে দেখা গেল। মদ্য পান করিয়া সে দোকানের বাহিরে আসিয়া কোন্ দিকে যাইবে, তাহাই বোধ করি চিন্তা করিতেছে···

এমন সময় একটা শব্দ···চীৎকার···একখানা মোটর ছুটিয়া যাইতেছে! দারোগার কণ্ঠস্বর! মোহনলাল ও কবীর ছুটিয়া মদের দোকানের সাম্‌নে উপস্থিত হইল। দোকানের সিঁড়ির ধাপে কোঠারি পড়িয়াছে···তাহার কপালের উপর রক্তাক্ত ছিদ্র···বন্দুকের গুলি মাথার খুলি ভেদ করিয়াছে! এক মুহূর্ত্তে একটা অবিশ্বাস্য অঘটন ঘটিয়া গেল। মোহনলাল বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মদের দোকানের বিপরীতদিকে একটা ছোট একতালা বাড়ী। দরজা বন্ধ! একধারে একটা ছোট জানলা খোলা রহিয়াছে। মোহনলাল ছুটিয়া গিয়া সে বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল···দরজা খুলুন···দরজা খুলুন···কোন সাড়া নাই। কবীর ও মোহনলাল দু'জনের সমবেত ধাক্কায় দরজা ভাঙিয়া পড়িল···দেখা গেল, বাড়ীতে জনপ্রাণী নাই।

বাড়ীর পিছনদিকে একখানা মোটর দাঁড়াইয়াছিল, সেখানা পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! বোঝা গেল, এই বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া হত্যাকারী অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কে সে? কেনই বা কোঠারিকে হত্যা করিল? দারোগাকে নিকটস্থ থানায় পাঠাইয়া কবীরকে লইয়া মোহনলাল যুগলদাসের বাড়ী অভিমুখে চলিল। যুগলদাসের মোটর বাহির হইয়াছে কিনা, অথবা ইতিমধ্যে কোন মোটরে সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে কিনা, সে সংবাদ সতুর কাছে পাওয়া যাইবে।

তাহাদের মুখে কোঠারির হত্যার বিবরণ শুনিয়া সতু বিস্ময়ে হতভম্ব হইল। কিছুক্ষণ পরে জানাইল, কেহ মোটরে এদিকে আসে নাই। তাহারা পায়ে পায়ে মোড়ের মাথায় আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে একজন ডাকপিওন আসিতেছে। মোহনলাল তাহাকে কাছে ডাকিল। যুগলদাস সম্বন্ধে এ লোকটার নিকট হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায় কি না দেখা যাক। ডাকপিওন নিকটে আসিয়াছে, এমন সময় পথের বাঁকে ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেল। একখানা কালো রঙের বড় মোটর এই দিকেই আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে মোটরখানা তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোহনলাল দেখিল, গাড়ীতে একটি মাত্র আরোহী। সে-ই চালক। চালককে উদ্দেশ করিয়া ডাকপিওন সেলাম করিল। ক্ষণকাল পরে মোহনলাল বলিল—রায় সাহেব যুগলদাস বুড়ো হলেও এখনো দেহে বেশ শক্তি আছে, কি বল। তা না থাকলে আর এ-ভাবে মোটর চালাতে পারে!

ডাকপিওন কহিল—আজ্ঞে, যিনি মোটর হাঁকিয়ে গেলেন, উনি তো রায় সাহেব নয়। ওঁয়ার সিক্রিটারী দয়ারামবাবু গাড়ী চালিয়ে গেলেন।

মোহনলাল তৎক্ষণাৎ কহিল—ঠিক। আমিই ভুল করেছিলাম। দয়ারামবাবু অনেকদিন রায় সাহেবের কাছে আছেন, না?

ঘাড় নাড়িয়া ডাকপিওন কহিল—অনেকদিন। ওঁর সব কাজ ইনিই তো করেন।

পিওন চলিয়া গেল। মোহনলাল ভাবিত হইল। এই দয়ারামের মোটরই মদের দোকানের নিকট দেখা গিয়াছিল। তাহা হইলে সে-ই কি কোঠারির হত্যাকারী! কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মোহনলাল কহিল—তোমরা এখানে অপেক্ষা করতে চাও, কর। আমি একবার রায় সাহেব যুগলদাসের গারেজের মধ্যে যাব।

—সে কি! কেউ যদি দেখে ফেলে?

মোহনলাল কহিল—দেখে যদি ফেলে, তার কৈফিয়ৎ আছে। আমাকে একবার দয়ারাম যে-মোটর চালিয়ে এলো, সেই মোটরখানার ভিতরটা দেখতেই হবে।

মোহনলাল চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ সাফল্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল! কহিল—বুড়ো হ'লে কি হয়, রায় সাহেব যুগলদাসের সখ্ এখনো মেটেনি। মাথায় পমেটম মাখে!

কবীর কহিল—কিন্তু কোঠারির হত্যার সঙ্গে এর. কি সম্পর্ক আছে?

মোহনলাল জবাব দিল—আছে বৈকি! এর দ্বারায় প্রমাণ হয়েছে যে রায় সাহেব যুগলদাস গাড়ীর মধ্যে ছিলেন। সীটের নীচে পাপোসের ওপর তিনি লম্বা হয়ে গুড়ি মেরে শুয়েছিলেন। একদিকের দরজায় তাঁর জুতোর দাগ লেগেছে। অন্যদিকে লেগেছে পমেটমের দাগ! সুতরাং তিনি গাড়ীতেই ছিলেন। খুব চালাকী করেই ছিলেন—যাতে কেউ না তাঁকে দেখতে পায়। এখন অনেকখানি সংবাদ পাওয়া গেল। কোঠারি যে বন্দুকের গুলিতে মারা পড়েছে, সে গুলিটা আমরা হত্যার জায়গা থেকে পেয়েছি। এখন বন্দুকটা যদি আবিষ্কার করতে পারি, তাহলেই একটা কাজ শেষ হয়।

আঠারো

দারুক, লেবং এবং সোহিনী! রায় সাহেব যুগলদাসের সঙ্গে তাহারা দেখা করিতে আসিয়াছে। প্রথমে তিনি তাহাদের সহিত দেখা করিতে চাহেন নাই। কিন্তু দারুক যখন একটি সিগার চাকৃতি চাকরের হাতে দিয়া তাহা তাহার মনিবকে দিতে বলিল, তখন সদ্য ফল ফলিল। চাকর আসিয়া জানাইল, কর্ত্তা এখনি আসিতেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাক্ষাৎ হইল। নমস্কারাদি বিনিময়ের পর রায় সাহেব বলিলেন—দারুকবাবু,

আপনাকে ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। বলুন, কি আপনার প্রয়োজন আমার কাছে!

মোলায়েম স্বরে দারুক বলিল—সম্প্রতি একটি জাহাজ-কোম্পানী খুলেছি রায় সাহেব। কিন্তু মূলধন আমাদের কম। তাই আপনার কাছে এসেছি। আমরা জানি, স্বদেশের ব্যবসায় আপনার দান কত বড় এবং কত উৎসাহ আপনি সকলকে দিয়ে থাকেন। আমাদের এই কোম্পানীটি একেবারে অকেজো নয়। ইতিমধ্যে কিছু কাজ আমরা করেছি। পনেরো বছর আগে সমুদ্রের মোহানায় 'এস্ এস্ অজন্তা' নামে যে জাহাজ ডুবি হয়েছিল, আমরা তার সন্ধান পেয়েছি। এখন মূলধন কিছু পেলেই আমরা সেই জাহাজের মাল ওঠাতে পারি!

দারুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রায় সাহেবকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রায় সাহেব বলিলেন—আমি···আমি এ-বিষয়ে তেমন আগ্রহের কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

দারুক কহিল—মনে করবেন না আমরা বাজে কথা বলছি। 'অজন্তার' খোঁজ আমরা পেয়েছি। এখন কিছু টাকা হলেই··· বুঝছেন আমাদের কথা···এ-বিষয়ে আমাদের আরও একটি প্রস্তাব আছে। সাগরের তলায় 'অজন্তা' ঠিক কোন্ স্থানে আছে, কী মাল তাতে আছে, তা আমরা জেনেছি। এখন কিছু টাকা ফেলে সেই জাহাজের মাল উদ্ধার করা। টাকার অভাবে আমরা যখন পার্চ্ছি না, তখন আপনি আমাদের কোম্পানীটা কিনে নিন।

কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া ঈষৎ বিকৃতকণ্ঠে যুগলদাস প্রশ্ন করিলেন—কত টাকা পেলে আপনারা ব্যবসাটি বিক্রি করবেন?

দারুক কহিল—পাঁচ লাখ পেলেই আমরা ছেড়ে দেব। আপনার পক্ষে কিছুই নয়। সহজেই দিতে পারবেন।

ক্রোধে রায় সাহেবের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কহিলেন—ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে চান!

মহাবিস্ময়ের ভান করিয়া দারুক কহিল—ভয় দেখিয়ে! সে কি মশায়! আমরা একটি ব্যবসা আপনাকে বিক্রি করব। তার দাম···এর মধ্যে···

—ও-সব ধাপ্পাবাজী ছেড়ে দিন। যুগলদাসের কণ্ঠস্বর অধিকতর বিকৃত এবং ভগ্ন শুনাইল—সিসের চাকতি দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি···

নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দারুক বলিল—যাক। তাহলে আমার অনুমান ব্যর্থ হয়নি! টাকাটা পাওয়া যাবে তাহলে।

আপন মনে যুগলদাস কহিলেন—পনেরো বছর পরে···কে জানতো, পনেরো বছর পরে বেইজ্জত হতে হবে। তোমরা আসবার আগে আর-একজন এসেছিল। বোধ হয় তোমাদেরই দলের লোক···

হঠাৎ রায় সাহেব থামিয়া গেলেন। দারুক কহিল—কোঠারি এসেছিল! কত দিতে হল তাকে?

—ওসব কথা যাক। যুগলদাস যেন ইতিমধ্যে নিজের

কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছেন—এখন বল, কত টাকায় রফা করতে চাও।

অনেক দরাদরির পর তিন লক্ষ টাকায় রফা হইল। তবে টাকাটা দারুকের নগদ চাই। স্থির হইল, কাল সকালে দশটার সময় তাহারা তিনজন যুগলদাসের বাড়ী আসিবে এবং নগদ টাকা লইয়া ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্র সম্পূর্ণ করিবে।

প্রসন্নমনে তিনজনে প্রস্থান করিল। তাহারা কল্পনাও করিতে পারিল না, তাহাদের জন্য কি ভীষণ পরিণাম অপেক্ষা করিতেছে।

উনিশ

হাওড়ার থানায় আসিয়া সতু যথারীতি রিপোর্ট দিল। যুগলদাসের বাড়ী হইতে তিনজনে ফিরিয়া একটা হোটেলে উঠিয়াছে। মোহনলালের পরামর্শমত কোঠারি-হত্যার ব্যাপারটা বেমালুম চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহার দলের লোকেরা পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। স্থির হইয়াছে, রাত্রে আর কোন সন্ধান না করিয়া কাল সকালে মোহনলাল যুগলদাসের বাড়ী যাইবে। পরদিন প্রভাতে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সকাল ন'টা নাগাদ স্বয়ং রায় সাহেব যুগলদাস থানায় দর্শন দিলেন। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিত। অভ্যর্থনা করিয়া

তাঁহাকে বসাইল। মোহনলাল ও কবীরের পানে বারেক চাহিয়া যুগলদাস বলিলেন—একটা ব্যাপারে কিছু বিচলিত হয়েছি গিরিশবাবু।

থানার অফিসারের নাম গিরিশ। সে কহিল—কি ব্যাপার বলুন। এঁদের কাছে গোপন করবার দরকার নেই। এঁরা কলকাতা পুলিশের লোক।

রায় সাহেব পকেট হইতে এক চিলতা লালরঙের কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন—'ধর্ম্মপুত্র' নামে একদল লোক এই চিঠি দিয়েছে! আমি বুঝতে পারছি না, কি করা উচিত!

সকলে লাল-কাগজখানির প্রতি ঝুঁকিল। তাহার উপর কালো কালিতে ইংরাজীতে যাহা লেখা আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :

"বহু লোককে ঠকাইয়া, গত যুদ্ধে আপনি কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়াছেন। সেই টাকার পিছনে আছে বহু শ্রমিক ও দরিদ্রের বুকের রক্ত। তারই প্রতিদান স্বরূপ আপনার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই। দশ টাকার নোটে সেই টাকা একটা ব্যাগের ভিতর ভরিয়া আপনি কাল রাত্রি বারোটার মধ্যে বাকল্যাণ্ড পুলের দক্ষিণ অংশের নীচে রাখিয়া আসিবেন। একাকী যাইবেন। যদি আমাদের কথায় রাজী না হ'ন, তাহা হইলে, পরশু আপনাকে জীবন্ত রাখা হইবে না। ইতি ধর্ম্মপুত্রের দল।"

বহুক্ষণ ধরিয়া কাগজখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া

মোহনলাল প্রশ্ন করিল—এ ডাকাতে-চিঠি আপনি কখন্ পেয়েছেন রায় সাহেব ?

তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে রায় সাহেব বিশেষ স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছিলেন না। জড়িতস্বরে কহিলেন—কাল সকালে।

—কাল সকালে! চিঠিখানা পেয়ে আপনার কি মনে হল ?

মোহনলালের প্রশ্নের উত্তরে রায় সাহেব কহিলেন—রীতিমত ভয় হয়েছে আমার।

—তাহলে তো পত্রখানা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার আসা উচিত ছিল আমাদের কাছে। বড্ড দেরী ক'রে ফেললেন···

—অ্যাঁ। তাহলে কি···

মৃদু হাসিয়া মোহনলাল কহিল—আপনার কোন চিন্তা নেই! তবে একটা কথা। আজ সকালে আপনার বাড়ীতে কারুর আসবার কথা আছে ?

মোহনলালের এই অতর্কিত প্রশ্নে কয়েক মুহূর্ত্ত বিমূঢ় থাকিয়া সজোরে যুগলদাস বলিলেন—আজ সকালে! কৈ নাঃ।

মোহনলাল নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া ছিল। তাহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল—তাহলে চলুন, সবাই মিলে এখুনি আপনার বাড়ী যাওয়া যাক। এবং বাড়ীর চারিদিক দেখা যাক। কে জানে, ডাকাতগুলো সকাল থেকেই আপনার বাড়ীর আশেপাশে ওৎ পেতে আছে কিনা।

যুগলদাস কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার কোন আপত্তি টিকিল না। পুলিশের মোটর প্রস্তুত হইল। তাহাতে সতু

প্রভৃতি উঠিল। যুগলদাসের গাড়ীতে কবীর ও মোহনলাল চাপিয়া বসিল।

মোটর দু'খানা যখন যুগলদাসের বাড়ীর গেটের সামনে আসিয়া থামিল, তখন বেলা ঠিক দশটা। গেটের কাছে কিছু দূরে একখানা কালো রঙের মোটর দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই মোহনলাল চিনিল। এই মোটরখানাই লালপুরে সেদিন তাহার ঘাড়ে পড়িয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মোহনলাল যুগলদাসকে প্রশ্ন করিল—এ-মোটরে কারা এসেছে জানেন?

বিব্রতকণ্ঠে তিনি বলিলেন—না। জানিনে তো।

মোহনলাল বলিল—তাহলে বোধ হয় তারাই এসেছে। এতক্ষণে তারা বেঁচে আছে কিনা কে জানে?

রায় সাহেব বলিলেন—সে কি মশায়! তাদের মারবে কে? ধর্ম্মপুত্রের দল?

মোহনলাল কহিল—আজ্ঞে না। আপনার কোন জঘন্য ফন্দীর জালে প'ড়ে তারা প্রাণ হারাতে বসেছে। ধর্ম্মপুত্রের দলের কোন অস্তিত্ব নেই। পুলিশের চোখে ধূলো দেবার জন্যে ও চিঠি আপনি নিজেই রচনা করেছেন।

—আপনি··আপনি কি বলছেন মশায়!

মোহনলাল বলিল—ঠিকই বলছি। তিনজন লোক, দু'জন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক। তারা আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চায়। অতীতকালের কোন দুষ্কর্ম্ম চেপে

ফিরিয়া পাইয়া এবং কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া দারুক যখন শুনিল যে, তাহার সঙ্গীদ্বয় প্রাণ হারাইয়াছে এবং অপর সঙ্গী কোঠারি যুগলদাসের হাতে নিহত হইয়াছে, তখন সে সমস্ত কথাই স্বীকার করিতে সম্মত হইল। তাহার কথায় জানা গেল, তাহারা যুগলদাসের বাড়ী আসিলে তাহার সেক্রেটারী জানায় যে তাহার মনিব বাহিরে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন। এই বলিয়া তাহাদের একটি ঘরে বসাইয়া চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে ঘরের এক কোণ দিয়া গ্যাস আসিতে থাকে। তখন তাহারা বাহির হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু দেখে দরজা বাহির হইতে বন্ধ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুগলদাসের সেক্রেটারী দয়ারামকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং সে স্বীকার করিল যে মদের দোকানের বিপরীত দিকের বাড়ীর মধ্য হইতে যুগলদাস বন্দুক ছুঁড়িয়া কোঠারিকে হত্যা করিয়াছে। তদন্তের ফলে যুগলদাসের অনেক পাপ কীর্ত্তির কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মৃত্যু-পণ করিয়া মোহনলাল এক সঙ্গে এক পুরাতন দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত এবং সমাজের একজন গণ্যমান্য গুপ্ত সয়তানকে জব্দ করিল।

শেষ

পরবর্ত্তী গ্রন্থ